লেখক পরিচিতি

সর্বজন নন্দিত জ্ঞানতাপস **শ্রীযুক্ত বাবু নূতন চন্দ্র বড়ুয়া** চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সাহাব্দীনগর গ্রামে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এক মধ্যবিত্ত বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম চিকন চন্দ্র বড়ুয়া এবং মাতার নাম হরসুন্দরী বড়ুয়া। তিনি ছিলেন মাতা-পিতার সর্ব কনিষ্ঠ ছেলে। তিনি বাল্যকালে নিজ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা পরিসমাপ্ত করে রাঙ্গুনিয়া আদর্শ বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক মানবিক বিভাগে অধ্যয়ন করেন। এতদ্‌সঙ্গে রাঙ্গুনিয়া রাজানগর সদ্ধর্মোদয় পালি টোল থেকে সূত্রপিটকের আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সূত্রবিশারদ উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি রাঙ্গুনিয়া আদর্শ বহুমূখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রায় চল্লিশ বৎসর শিক্ষকতা করে ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে অবসর প্রাপ্ত হন। শিক্ষকতার কাজে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি প্রায় বিশ বৎসর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদে এবং চট্টগ্রাম জজ কোর্টের জুরারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকটি বৌদ্ধ ধর্মীয় পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। এতাদৃশ সরল জীবন যাপনের আদর্শ গ্রহণে তিনি হয়েছেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাঁর নিরলস সমাজসেবা এবং তত্ত্ব ও তথ্য বহুল সাহিত্য কীর্তি অবিস্মরণীয়।

"চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস" তাঁর জীবন সায়াহ্নের অন্তিম অবদান। এ গ্রন্থটি পাঠে তাঁর চিন্তা প্রসূত গভীর জ্ঞানের বহুল পান্ডিত্যপূর্ণ তথ্য অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক তথ্য ও চিন্তার সম্পদে নিঃসন্দেহে মূল্যবান। তিনি ১৯৯৮ ইংরেজী ৭ই ডিসেম্বর সকল মায়ার বন্ধন উপেক্ষা করে ইহলোক ত্যাগ করেন।

বিনীত

মৃদুল কান্তি বড়ুয়া
কাঝরদিঘীর পাড়, নোয়াপাড়া,
রাউজান, চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস

নূতন চন্দ্র বড়ুয়া

চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস ● নূতন চন্দ্র বড়ুয়া

চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস

নূতন চন্দ্র বড়ুয়া (সূত্র বিশারদ)

অবসর প্রাপ্ত পালি শিক্ষক, রাঙ্গুনীয়া আদর্শ বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়; প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক, বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। সহ-সভাপতি সাহাব্দীনগর উচ্চ বিদ্যালয়।

গ্রাম ঃ সাহাব্দীনগর, ডাকঘর ঃ মোগলের হাট,
রাঙ্গুনীয়া উপজেলা, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ।

- **চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস**
  নূতন চন্দ্র বড়ুয়া (সূত্র বিশারদ)
- প্রথম প্রকাশনা ঃ
  কুসুম কুমার বড়ুয়া ও শম্পা জ্যোতিঃ বড়ুয়া।
  ঘাটচেক, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।
- দ্বিতীয় প্রকাশনা ঃ
  সুমেধ বড়ুয়া ও দিপ্তী বড়ুয়া
  গ্রাম ও পোঃ পূর্বগুজরা, থানা ঃ রাউজান, চট্টগ্রাম।
- মুদ্রণে ঃ **কণিকা এ্যাড**
  ২নং সিটি কর্পোরেশন মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
  মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৫৪২১৯০, ০১৭১৬-১৪৩৯৭০, ০১৭১১-৭১১৭৮২
- প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় ঃ **আশিষ বড়ুয়া,** গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

- **সর্বস্বত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত।**

- প্রথম সংস্করণ ঃ **প্রবারণা পূর্ণিমা, ২৫৩০ বুদ্ধাব্দ, ১৯৮৬ ইংরেজী**
- দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ **বুদ্ধ পূর্ণিমা ২৫৫৪ বুদ্ধাব্দ**
  ১৭ই মে ২০১১ ইংরেজী, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ সন।
- প্রাপ্তি স্থান ঃ
  ☆ **নালন্দা লাইব্রেরী,** আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
  ☆ **সোনাইছড়ি রাজ বিহার,** সোনাইছড়ি, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।
  ☆ **জ্ঞানাঙ্কুর বিহার,** পূর্বগুজরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
- শ্রদ্ধাদান ঃ **১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা) মাত্র।**
  (শ্রদ্ধাদান বুদ্ধ বিহারের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ব্যয় হবে।)

বৌদ্ধ ধর্মের সারাংশ

ত্যাগ কর পাপকর্ম যত নরগণ,
সকল কুশলকর্ম কর সম্পাদন;
নিজ চিত্ত শুদ্ধ কর বুদ্ধগণ বলে,
ত্রিপিটকের মর্মার্থ জানহে সকলে।

'ধর্ম্মপদ'

শ্রদ্ধার/স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ
উপহার ঃ **চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস।**

প্রাপকের নাম–
গ্রাম–　　উপজেলা–
ডাকঘর–　　জেলা–

দাতার নাম–
গ্রাম –　　উপজেলা–
ডাকঘর–　　জেলা–
তারিখ–

উৎসর্গ

যেই
মাতা-পিতা
ব্রহ্ম সদৃশ পূর্বাচার্য
এবং যাঁহাদের স্নেহে আমি প্রতি-পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত
সেই পরলোকগত পিতা চিকন চন্দ্র বড়ুয়া
এবং পরলোকগতা মাতা হর সুন্দরী বড়ুয়ার
স্বধর্মে অচলা পুণ্য-স্মৃতি স্মরণে
"চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস"
গ্রন্থখানি পরম শ্রদ্ধার সহিত
উৎসর্গীকৃত-
হইল।

গ্রন্থকার।

বৌদ্ধ যুগাবর্তন

বৌদ্ধ যুগ নাই বলে,
না ভাবিও মনে।
আসিতেছে বৌদ্ধ যুগ,
যুগ আবর্তনে।

গ্রন্থকার ঃ
পালি শিক্ষক নূতন চন্দ্র বড়ুয়া (সূত্র বিশারদ)
জন্ম ঃ ১লা জানুয়ারী, ১৯০৪ ইংরেজী।
মৃত্যু ঃ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯৮ ইংরেজী।

মঙ্গলাচরণ

প্রথমে বন্দনা করি বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘে,
তারপর বন্দি আমি মাতা-পিতা গুরু,
যাঁহারা আছেন ধরি' সদ্ধর্মের তরু।
লুপ্তধর্ম কিরূপেতে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গে,
সমগ্র ভারত হ'তে হইয়া বিলুপ্ত।
বিকৃত কেমনে হ'ল পালি উচ্চারণ,
এই গ্রন্থে আমি তাহা করিব বর্ণন।
রয়েছিল যে ঐতিহ্য চিরতরে লুপ্ত;
ত্রিরত্নের স্থিতি হেতু উৎসর্গে জীবন,
তাঁহাদের আদর্শ হোক রূপায়িত
ভবিষ্যৎ জাতি মাঝে। যাহারা বিচ্যুত
তাহাদের পথে-আনা করেছি স্মরণ;
কিরূপে লুপ্ত গৌরব হইবে উদ্ধার,
তাহাই বর্ণিব আমি এই গ্রন্থ সার।

পালি শিক্ষক
নূতন চন্দ্র বড়ুয়া, (সূত্র বিশারদ)।

আজীবন শিক্ষব্রতী

প্রয়াত শ্রীযুক্ত বাবু রোহিণী রঞ্জন বড়ুয়া

(শিক্ষক ঃ- ফতেয়াবাদ বহুমুখী আদর্শ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়)।

জন্ম ঃ ২২শে এপ্রিল ১৯০২ খৃষ্টাব্দ

মৃত্যু ঃ ২০শে জুলাই ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দ

ও

তদীয় সহধর্মিনী

শ্রীমতি প্রীতি কুসুম বড়ুয়া

গ্রাম ও পোঃ পূর্বজুরী

থানা ঃ রাউজান, চট্টগ্রাম।

"পূর্বাভাষ"

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত রাউজান উপজেলার হদখাল সংলগ্ন পশ্চিম পাশে অবস্থিত প্রাকৃতিক ঐতিহ্যবাহী পূর্বগুজরা গ্রামের প্রবীণ শিক্ষাবিদ, হাটহাজারী উপজেলার ফতেয়াবাদ আদর্শ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আমার বেহাই রোহিনী রঞ্জন বড়ুয়া মৎ বিরচিত **"বৌদ্ধ বিবাহ মন্ত্র ও ইতিবৃত্ত"** ও **"চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস"** আদ্যন্ত দর্শনে সন্তুষ্ট চিত্তে সমাজ হিতৈষনার জন্য মুদ্রণ ব্যাপারে প্রবল উৎসাহ প্রদান করায় এতৎসঙ্গে তাঁহার পরিচিতি প্রদান সমীচীন মনে করি। তাঁহার চিত্তাকর্ষণ মূলক আলাপে ও ব্যবহারে আমি অত্যধিক বিমুগ্ধ।

তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক মধ্যবিত্ত বৌদ্ধ পরিবারে সন্ত্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালি কুমার বড়ুয়া এবং মাতার নাম সুরবালা বড়ুয়া। তাঁহার সহধর্মীনীর নাম প্রীতিকুসুম বড়ুয়া। দীপঙ্কর, সুদত্ত ও সুমেধ নামে তাঁহার তিনজন ছেলে এবং মিনতি, নিয়তি, তপতি, প্রণতি ও স্মৃতি নামে পাঁচজন মেয়ে। তাহারা সকলেই শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত। ছেলেরা সকলেই চাকুরী জীবন যাপনে আত্মনির্ভরশীল।

তৎকালে লেখাপড়া শিক্ষার সুগম ছিল না। তিনি গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা পরিসমাপ্তির পর দূরবর্তী পাহাড়তলী মহামুনি এংলো পালি ইনষ্টিটিউসন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনটি লেটার সহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রত্যেক ক্লাশেই প্রথম স্থান অধিকার করে মেধাবী ছাত্র হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। তৎপর তিনি চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কলেজে ভর্তি হন। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি ফতেয়াবাদ আদর্শ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে পালি শিক্ষক

পদে নিযুক্ত হন। উক্ত বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ তাঁহার কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে পরিচয় পেয়ে তাহাকে কুমিল্লায় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শরীর চর্চা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ এবং ঢাকা তেজগাঁও কৃষিবিদ্যা কলেজে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি উভয় প্রশিক্ষণে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর শিক্ষকতা করে সসম্মানে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে অবসর প্রাপ্ত হন।

সুদীর্ঘকাল পালি ভাষা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মাধ্যমে তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

'ন পরেসং বিলোমানি, ন পরেসং কতাকতং,
অত্তনো'ব অবেক্খেয়্য কতাতিন অকতানি চ'।

অর্থাৎ অন্যের কৃত ও অকৃত কর্মের সমালোচনা না করে নিজের আত্মনুশীলন ও আত্ম সংশোধন করাই উত্তম।

তিনি ধর্মপদের এই গাথাটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে নিজের জীবন গঠনে প্রয়াস পান।

তারিখ ঃ
১৮/২/৮৯ ইংরেজী।

অনুগ্রহ প্রার্থী
গ্রন্থকার।

উৎসর্গ

বুদ্ধ গুণ অচিন্তনীয়
ধর্ম্ম গুণ অচিন্তনীয়
সংঘ গুণ অচিন্তনীয়
আচরিয় গুণ অচিন্তনীয়
মাতা পিতা গুণ অচিন্তনীয়
ইমং পঞ্চগুণং অচিন্তনীয়
ইমং পঞ্চগুনানি, অহং বন্দামি সব্বদা॥

"চট্টগ্রামের বৌদ্ধজাতির ইতিহাস" পুনঃ প্রকাশনা জনিত পূণ্য রাশি অনন্ত গুণের অধিকারী পরম হিতৈষী প্রয়াত পিতা, আজীবন শিক্ষাব্রতী ফতেয়াবাদ আদর্শ বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রোহিনী রঞ্জন বড়ুয়া, মমতাময়ী মাতা শ্রীমতি প্রীতি কুসুম বড়ুয়া, কল্যাণকামী শ্বশুর বিদ্যোৎসাহী মনিষী রাঙ্গুনীয়া আদর্শ বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষাবোর্ডের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক প্রয়াত শ্রীযুক্ত নূতন চন্দ্র বড়ুয়া ও মাতৃতুল্য শ্বাশুড়ীমাতা প্রয়াত শ্রীমতি স্নেহলতা বড়ুয়া তৎসহ আমাদের প্রয়াত ও জীবিত জ্ঞাতীবর্গ এবং জগতের সকল সত্ত্বের নির্বাণ লাভের হেতু হোক।"

সব্বে সত্ত্বা সুখিতা হোন্তু
জয়তু বুদ্ধ সাসনম।

ইতি-
সুমেধ বড়ুয়া
স্ত্রী ঃ- **দীপ্তি বড়ুয়া** (দিবা)
গ্রাম ঃ পূর্ব গুজরা (রোহিনী মাষ্টারের বাড়ী),
পো ঃ পূর্বগুজরা, থানা ঃ রাউজান,
জিলা ঃ চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

প্রকাশকের অভিমত

"নমো বুদ্ধায়"

মানব জীবন বড় দুর্লভ, বহুজন্মের সাধনার ফলে আমরা মানবজীবন লাভ করে থাকি। আবার কোন অঙ্গহানি বা বিকলাঙ্গ না হয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। অন্যদিকে জ্ঞানী বা বুদ্ধের উৎপত্তি ও সদ্ধর্ম শ্রবণ ও দুর্লভ ব্যাপার, কারণ জগতে সব সময় বুদ্ধ বা সদ্ধর্মের উপস্থিতি থাকে না।

মানবজীবন লাভ করেও সংসারচক্র থেকে বিজ্ঞমানুষ যদি মুক্ত হতে না পারে তাহলে তারা কখন মুক্ত হবে? মানুষের অন্তর সাধারণত লোভ দ্বেষ মোহে আচ্ছন্ন থাকে। লোভদ্বেষ মোহে আচ্ছন্ন থাকে বলেই মানুষ অনিত্যকে নিত্য, অশুভকে শুভ, দুঃখকে সুখ, সত্যকে মিথ্যা বলে জানে। এই মিথ্যা দর্শনের কারণে মানুষের কখনো দুঃখের শেষ হয় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ কামনা বাসনা ও তৃষ্ণায় বিভোর হয়ে থাকে। মানুষের চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই। জাগতিক প্রাপ্তি, ভোগ বিলাস, অর্থ বিত্ত ইত্যাদির জন্য মানুষ নিরন্তর ছুটছে। চিন্তা করার এমনকি বিশ্রাম নেয়ার সময় ও নেই। মানুষ সব সময় মনে করে এটা-ওটা লাভ করতে পারলে সুখী হতে পারবে। সব পরিপূর্ণ হবে। কিন্তু বাস্তবে তা কখনো হতে দেখা যায় না। একটি অভাব পূরণ হলে নূতন আরেকটি অভাব দেখা দেয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি বিন্দুমাত্র স্বস্তি নেই। কেবল চাওয়া পাওয়া, সুখ-শান্তিতে থাকার নিরন্তর প্রচেষ্টা। এভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে করতে একদিন অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে তাকে চলে যেতে হয় চিরতরে। দুর্লভ মানবজীবন এভাবে অতিবাহিত করা উচিত নয়। এতে মানব জীবনের স্বার্থকতা নেই।

এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেছেন "সমগ্র সংসারে সুখের পরিমাণ ভোরের তৃনাগ্রে শিশির বিন্দুবৎ অতীব তুচ্ছ এবং সে তুলনায় দুঃখের পরিমাণ সমুদ্রের জলরাশিবৎ অগাধ অপ্রমান। সমগ্র ত্রিলোকময় কেবল দুঃখ।

এভাবে লোভ, দ্বেষ, মোহে, মানুষেরা আমার পুত্র, আমার স্ত্রী আমার কন্যা, আমার স্বামী, আমার বাড়ী, আমার ধন, আমার সম্পত্তি, বিদ্যাবুদ্ধি, রূপযশ ও মান-অভিমানে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে, সর্বদা জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয় যাচ্ছে। লোভ, দ্বেষ, মোহাগ্নিতে এ জগত নিত্য প্রজ্বলিত হচ্ছে। এ প্রজ্বলিতদের উদ্দেশ্যেই বুদ্ধ বলেছেন–"এ প্রজ্বলন অবস্থায় তোমাদের কিসের এত হাসি? কিসের এত আনন্দ? তোমরা কি চিরদিন মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে? আলোর সন্ধান করবে না?"

সুতরাং আসুন আমরা সদ্ধর্মের অনুশীলন করে এ দুঃখ সাগরের ভবচক্রের চির অবসান ঘটাই। রাঙ্গুনীয়া আদর্শ বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ পালি শিক্ষক এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা, বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষাবোর্ডের প্রশ্নকর্তাও পরীক্ষক আমার পরম কল্যাণকামী শশুর বিদ্যোৎসাহী মনিষী আজীবন শিক্ষাব্রতী প্রয়াত শ্রীযুক্ত নূতন চন্দ্র বড়ুয়া মহোদয় কর্তৃক বিরচিত **"চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস"** গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশনার জন্য সোনাইছড়ি রাজ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

প্রসঙ্গত অত্র গ্রন্থে সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান পতনের এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সম্মানিত পাঠক সমাজের জন্য উপস্থাপিত হওয়ায় গ্রন্থটির প্রয়োজন অত্যাধিক বলে মনে করি। শুধু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য নয়, বরং সকল ধর্মের সম্মানিত পাঠকের কাছে বইটি যথেষ্ঠ সমাদৃত হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করি।

গ্রন্থটি পুন প্রকাশনায় এহেন–পূন্য অর্জনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য পরম জ্ঞাতী রাঙ্গুনীয়া সোনাইছড়ি রাজ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ ভদন্ত শ্রীমৎ সুনন্দ থের মহোদয়ের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সব্বে সত্ত্বা সুখিতা হোন্তো।

সুমেধ বড়ুয়া
এভিপি এণ্ড ডেপুটি ম্যানেজার
মিউচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ
খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম।

ভূমিকা

রাঙ্গুনীয়া আদর্শ বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক বাবু নূতন চন্দ্র বড়ুয়া, সূত্র বিশারদ মহোদয়ে'র সাথে আমার পরিচয় হয় রাঙ্গুনিয়া মহাবিদ্যালয়ে আমার অধ্যাপনা শুরু করার পর থেকে। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দানের সাথে সাথে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি বই লিখেছেন। তাঁর কর্মোদ্যম ও সাধনার অন্যতম ফসল **"চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস"** গ্রন্থটি। নামেই বুঝা যায় এটি চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমঃ বিকাশের একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা। গ্রন্থকার এই বইটির ভূমিকা লেখার এক গুরু দায়িত্ব দিয়ে আমাকে সংকটে ফেলেছেন। হয়ত নানা ব্যস্ততার অজুহাতে এই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু গ্রন্থকারের আন্তরিক নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক সাধনার যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে এই বইটির ভূমিকা লিখার দায়িত্ব পালন করতে পেরে আনন্দ ও গৌরব অনুভব করছি।

প্রধানতঃ দুইটি কারণে বইটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। প্রথমতঃ চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ এটিই প্রথম প্রচেষ্টা। এটি নিতান্ত সহজ কাজ নয়। এর পেছনে বহুদিনের সাধনা, গবেষণা ও নিরলস শ্রমের প্রয়োজন হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকলে এ ধরণের গ্রন্থ লেখা একে বারেই দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেদিক থেকে একজন উপযুক্ত লোকই যে এ কাজে হাত দিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গ্রন্থটি পাঠ করতে গিয়ে দেখা যায় যে গ্রন্থকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের

ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ও বিস্তারের পটভূমির পরিচয় দিতে ভুলেন নি। এই প্রসঙ্গেই চট্টগ্রাম অঞ্চল মানুষের আবাস ভূমিতে পরিণত হবার সূচনা কাল, পরবর্তীকালে চাক্মা ও চাক্মা রাজ বংশের ঐতিহাসিক রূপরেখা ইত্যাদির পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন। চাক্মারাই চট্টগ্রামের সর্ব প্রথম স্বাধীন জনগোষ্ঠী। সময়ের ব্যবধানে এরাই মগরাজা ও মোগল বাদশাহদের সাথে সন্ধি স্থাপন করে দীর্ঘকাল রাজত্ব করে এসেছেন। কিন্ত ভারতে বৃষ্টিশ শাসন শুরু হওয়ার পর থেকে চাক্মা রাজাদের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। বৃটিশ সরকারের ভাগকর শাসন কর নীতির ফলশ্রুতিতে চট্টগ্রামকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম নামে দুটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামকেই আবার মং সার্কেল, বোমাং সার্কেল এবং চাক্মা সার্কেল–এই তিন ভাগে ভাগ করে চাক্মা রাজার ক্ষমতা খর্ব করা হয়। বর্তমান গ্রন্থের লেখা এই সমস্ত বিষয় পর্যাক্রমভাবে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে আগ্রহী পাঠকের জন্য যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করেছেন।

বৌদ্ধ ধর্মই চট্টগ্রামের প্রাচীনতম ধর্ম। ত্রয়োদশ শতকে ভারত বর্ষের বৌদ্ধেরা উপর্যুপরি অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়। বৌদ্ধদের প্রায় সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কামানের গোলার আঘাতে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বৌদ্ধেরা প্রাণ ভয়ে দলে দলে ধর্মান্তরিক হয়ে পড়ে। নির্যাতনের মুখে পড়ে মগধ সাম্রাজ্য থেকে কিছু সংখ্যক রাজ বংশীয় ক্ষত্রিয় ধর্মভীরু বৌদ্ধ ধর্মান্তর গ্রহণ না করে পালিয়ে আসে এবং দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে পলায়নের পথে চট্টগ্রামে আগমন করে এবং তৎকালীন আরকানী বৌদ্ধ মগ রাজার কাছে আশ্রয় নেয়। নির্যাতিত ও ধর্মীয় দিক থেকে অবস্থা অনুকুলে

না আসায় এখানেই তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে এবং এভাবে কয়েক শতাব্দী স্থায়ীভাবে বসবাসের ফলে তাদের ধর্ম-কর্ম, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন যাপন-প্রভৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। তাদের পূর্ব ঐতিহ্য প্রায় বিলীন হয়ে যায়। এরাই বর্তমান বাঙ্গালী বৌদ্ধদের পূর্বসূরী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের ঐতিহাসিক পরিচয় বিধৃত করতে গিয়ে এই সমস্ত বিষয়ের উপর আলোক রশ্মি আলোচিত করেছেন এবং যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য সমূহ হাজির করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থকার সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান পতনের এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখাও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য হাজির করেছেন। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কিভাবে ভারত বর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করেছে, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে কিভাবে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার বন্ধ হয়েছে, উপরন্তু পতন ঘটতে শুরু করে গ্রন্থকার তারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে পতনের সেই অন্ধকার যুগ থেকে ধর্মে কর্মে, আচারে ব্যবহারে শিক্ষা দীক্ষায় ও চাকুরী জীবনে বৌদ্ধেরা কিভাবে আবার উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সচেষ্ট হল, তারও একটি বিবরণ গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাধি (পদবী), পালি ভাষায় উচ্চারণ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন।

গ্রন্থকার যে শুধু ঐতিহাসিক দায়িত্বই পালন করেছেন তাই নয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গৌরব কিভাবে আবার পুনরুদ্ধার করা যায়, সে-বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সম্প্রদায়গত

কর্ণধারের ভূমিকাও কিছুটা পালন করেছেন।

এই ধরণের একটি তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণা মূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করে গ্রন্থকার নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। বিশেষ করে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে তিনি যে বিশেষ সম্মান লাভ করবেন তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত অন্বেষার দিক থেকে চট্টগ্রামের বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ঐতিহ্য সত্যনুসন্ধানের ক্ষেত্র, এটি একটি বিশিষ্ট অবদান হিসেবেও সমাদৃত হবে। তাঁর এই উদ্যোগের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিই। শুধু বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কাছে নয়, বরং সকল অনুসন্ধিৎসু বাঙ্গালী পাঠকের কাছে বইটি যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে বলে আমার একান্ত বিশ্বাস।

আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ইতি

সুকোমল বড়ুয়া এম. এ.
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ,
রাঙ্গুনীয়া মহাবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
২৫/৬/৮৬ ইংরেজী।

শুভেচ্ছা বাণী

রাঙ্গুনীয়া আদর্শ বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ পালি শিক্ষক এবং বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা বাবু নূতন চন্দ্র বড়ুয়া সূত্র বিশারদ মহোদয়ের **'চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস'** নামক গ্রন্থে তাঁর অপরিসীম জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আমি সত্যই আনন্দিত হয়েছি। জাতীয় ইতিহাস জাতির পক্ষে পরম গৌরবের শুভবার্তা। তাই সর্বপ্রথম বাঙ্গালী বৌদ্ধ জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় গ্রন্থকারের অদম্য উৎসাহ ও প্রচেষ্ঠা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। অত্র গ্রন্থের বিশ্লেষনী ক্ষমতা, বিচার বুদ্ধি এবং নিরূপিত সত্যকে প্রমাণ সহ পাঠকের নিকট উপস্থিত করার সৎসাহস গ্রন্থকারের রচনার বিশেষত্ব। ভাষা যেমন সরল, প্রাঞ্জল ও হৃদয় গ্রাহী, প্রকাশ ভঙ্গিও তেমন মনোহর ও সুন্দর। তাঁর গ্রন্থের বর্ণিত সূচী পত্রের বিষয় বস্তু ও মর্মস্পর্শী পাণ্ডিত্য পূর্ণ লেখনী প্রসুত ভাব ব্যঞ্জক তথ্যপূর্ণ উৎস সর্বত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আর অধিক লিখে শুভেচ্ছা বাণীর সীমা অতিক্রম করা উচিত মনে করি না। তবে উপসংহারে বলা কর্তব্য যে লেখকের প্রদত্ত তথ্য এবং যুক্তি ও বিশ্লেষণ আমার কাছে খুবই উপাদেয় মনে হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গ্রন্থটি লেখা তাতে এটি তথ্যান্বেষী পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে।

ইতি

রাজ মাতা বিনীতা রায়
মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী,
বাংলাদেশ।

রাঙ্গামাটি, রাজবাড়ী
পার্বত্য চট্টগ্রাম।
২৫/১০/৮৬ ইংরেজী।

প্রস্তাবনা

সূচনা ঃ – চট্টগ্রামের বৌদ্ধজাতি ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার সুনিয়ন্ত্রিত আচার-ব্যবহারে কিরূপে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে, **'চট্টগ্রামের বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে'** তাহারই ধারা বিবরণী প্রকাশ করা হইয়াছে। এই ইতিহাসে অতীতের বৌদ্ধজাতির উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, ভাঙ্গা-গড়া ও সুখ-দুঃখের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। আর যাঁহারা চট্টগ্রামের বৌদ্ধজাতির অন্ধকার যুগে বৌদ্ধজাতির উন্নতির জন্য নিঃস্বার্থভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করিয়া গিয়াছেন, এই ইতিহাস তাঁহাদের স্মরণে রচিত হইয়াছে। ইতিহাস নিজ সৃষ্টির মহিমায় মহিমান্বিত এবং অতীতের গৌরবে গৌরবান্বিত। ইতিহাস অতীতের সাক্ষী, বর্তমানে জাতির পথ প্রদর্শক, ভবিষ্যতে অতীতের দৃষ্টান্ত দর্শনে হুঁশিয়ারী সঙ্কেতের ধারক ও বাহক। যাঁহারা নিজ নিজ আদর্শ ও ত্যাগে জাতির সর্ববিধ উন্নতির জন্য আমরণ সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই সর্বজন সমাদৃত, শ্রদ্ধাভাজন, অবিস্মরণীয় এবং জাতির স্বর্ণমুকুরে সমুজ্জ্বল হইয়া বিরাজমান থাকিবেন। কবি ভাষায় বলিতে গেলেঃ-

"সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে।
মনের মন্দিরে নিত্য,
সেবে সর্বজন।"

লুপ্ত তথ্যাদি আলোচনা ঃ- এতৎসঙ্গে পালি ভাষার উচ্চারণ ও বৌদ্ধ পরিচিতির লুপ্ত তথ্যাদি বৌদ্ধ সমাজে পুনঃ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে পাঠকদের অবগতির জন্য আলোচিত হইয়াছে। **'চট্টগ্রামের বৌদ্ধজাতির ইতিহাস'** রচনার উপকরণাদি সংগ্রহের ব্যাপারে তথ্যসংগ্রহ করা, ঘটনার সময়সূচী নির্দ্ধারণ করা ও সত্যানুসন্ধান করা অত্যন্ত সুকঠিন কাজ। তবুও বিবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইলেও ধৈর্যসহকারে বৌদ্ধজাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যের অপলাপ করা হয় নাই। কোন বিষয়ে ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইলে, তাহা আমাকে জানাইলে পরবর্তী সংস্করণে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। পাঠকদের মনে প্রাণে গ্রন্থের উপকরনাদি সত্য বলিয়া বিবেচিত হইলেই আমার পরিশ্রম হইবে সার্থক। কেননা আমার ভাষাজ্ঞান ও তথ্যানুসন্ধান সীমাবদ্ধ। তবুও পাঠকগণ দেখিবেন যে সংগৃহীত জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তুগুলি একদিকে যেমন উৎসাহ প্রদান করিবে, সেরূপ সাধারণ পাঠকদের অতীত সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধিৎসার তৃপ্তি বিধান করিবে এবং বৌদ্ধ জাতির সর্বাঙ্গ সম্পন্ন ইতিহাস লিখনে তাঁহাদিগকে আরও অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিবে।

অভিমত ঃ- রাঙ্গুনিয়া মহাবিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতপ্রবর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুকোমল বড়ুয়া এম, এ, মহোদয় তাঁহার অশেষ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অত্র গ্রন্থের জ্ঞানগর্ভ তথ্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ সুদর্শন ভূমিকা লিখিয়া দিয়া এবং বাংলাদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্যোৎসাহী স্বনামধন্যা মাননীয়া চাক্‌মা রাজ মাতা রাণী বিনীতা রায় মহোদয়া মৎ বিরচিত গ্রন্থ সম্বন্ধে সৌহৃদ্যতাপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ অভিমত প্রকাশ করিয়া উভয়েই গ্রন্থখানির গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

তজ্জন্য আমি সুধী যুগলের মহানুভবতার জন্য আমার অশেষ ধন্যবাদ, অনাবিল শ্রদ্ধা ও অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা করিতেছি।

প্রচ্ছদপট :- অত্র গ্রন্থের রুচি সম্মত প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা ও সুনিপুণ অঙ্কনের জন্য আমার স্নেহ প্রতিম ছাত্র রাঙ্গুনিয়া উপজেলার কুলকুরমাই নিবাসী শিল্পী শ্রীমান কল্যাণ মিত্র বড়ুয়া আমার অশেষ ধন্যবাদ ও অমোঘ কৃপাশীষের পাত্র। কেননা ইহাতে গ্রন্থের অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তজ্জন্য আমি ত্রিরত্ন সমীপে তাহার নিরাময় সুদীর্ঘ জীবন যাপন ও ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল সাফল্য কামনা করি। আর কুলকুরমাই সদ্ধর্মোদয় বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ ধর্মসেন ভিক্ষু মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রচ্ছদপট সাফল্যজনক কার্যে পরিণত হইয়াছে। তজ্জন্য আমি তাঁহাকেও অনাবিল কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

প্রকাশনা ঃ যুক্ত আরব রাষ্ট্রের আবুদাবিতে কর্মরত রাঙ্গুনিয়া উপজেলার ঘাটচেক গ্রাম নিবাসী আমার পরম স্নেহাস্পদ ধর্মপ্রাণ কুসুম কুমার বড়ুয়া তাহার পরলোকগত পিতৃদেব রজনী কান্ত বড়ুয়া এবং তাহার পরলোকগতা মাতৃদেবী প্রভাবতী বড়ুয়ার স্বধর্মে অচলা পূর্ণ্যস্মৃতি স্মরণে এবং তাঁহাদের পারলৌকিক মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যে মৎ বিরচিত **'চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস'** তাহারও তাহার সহধর্মিনী শম্পাজ্যোতিঃ বড়ুয়ার আর্থিক সহানুভূতিতে তাঁহাদের প্রতি ভক্তি তর্পনের নিদর্শন স্বরূপ অত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তজ্জন্য কুসুম কুমার ও শম্পাজ্যোতিঃর প্রতি আমার অশেষ ধন্যবাদ ও অফুরন্ত শুভাশীষ রহিল। তাহাদের ঈদৃশ সমাজ হিতৈষণার জন্য সুদীর্ঘকাল নিরাময় সুখ-শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন উপভোগ করিয়া এবং সর্ববিধ অন্তরায় হইতে মুক্ত থাকিয়া সকলের প্রতি প্রিয়ভাজন হউক এবং অত্র গ্রন্থ প্রকাশনায় অপ্রমেয় পূণ্য প্রভাবে তাহাদের কর্মপ্রতিভা মেঘমুক্ত বিদ্যুৎ প্রভা সদৃশ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠুক। ইহাই অনাদি-অনন্ত গুণসম্পন্ন ত্রিরত্ন সমীপে তাহাদের প্রতি আমার ঐকান্তিক সহানুভুতিপূর্ণ মাঙ্গলিক প্রার্থনা।

উপসংহার-আমার সর্বশেষ বক্তব্য এই, এত পরিশ্রম ও বিপুল অর্থ ব্যয়ে যে 'চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস' নামক গ্রন্থ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইল, তাহা জাতীয় তথ্যান্বেষী বৌদ্ধ পাঠক সমাজের নিকট সমাদর লাভ করিলে পরিণত বয়সের এই অপরিসীম পরিশ্রম ও বিপুল অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে মনে করিব। আর অশেষ যত্ন লওয়া সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য আমি দুঃখিত। আর্থিক সংকটের দরুণ গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে অনেক বিলম্ব হইল। অত্র গ্রন্থ প্রণয়নে যে সকল গ্রন্থকারের সক্রিয় সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি তাঁহাদের নিকটও আমার চির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। পরিশেষে ময়নামতি আর্ট প্রেসের স্বত্বাধিকারী বাবু সুকুমার বড়ুয়া মুদ্রণের ব্যাপারে সামগ্রীক সহযোগীতা সত্যই প্রশংসার দাবীদার।

আমার এই ইতিহাস মানব সমাজের মঙ্গল সাধিত হউক।

তারিখ ঃ-
২০/২/৮৬ইং

ইতি-
গ্রন্থকার

গ্রন্থকার ঃ

প্রয়াত শ্রীযুক্ত নূতন চন্দ্র বড়ুয়া (সূত্র বিশারদ)

(বহুগ্রন্থ প্রণেতা, রাঙ্গুনীয়া আদর্শ বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক)

ও

তদীয় সহধর্মিনী

প্রয়াত শ্রীমতি স্নেহলতা বড়ুয়া

গ্রাম ঃ শাহাব্দী নগর, পো ঃ পারুয়া

থানা ঃ রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

গ্রন্থকারের পরিচিতি

পরম শ্রদ্ধাভাজন সর্বজন নন্দিত জ্ঞানতাপস শ্রীযুক্ত বাবু নূতন চন্দ্র বড়ুয়া, সূত্র বিশারদ মহোদয় আমার শিক্ষা গুরু। চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় সাহাব্দীনগর গ্রামে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এক মধ্যবিত্ত বৌদ্ধ পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম চিকন চন্দ্র বড়ুয়া এবং মাতার নাম হরসুন্দরী বড়ুয়া। যুবরাজ, গোপীরাজ, তরণী সেন এবং রজনী নামে তাঁর চারি ভ্রাতা এবং ধন কুমারী নামে এক ভগিনী ছিলেন। তিনি ছিলেন মাতা-পিতার সর্ব কনিষ্ঠ ছেলে। তিনি বাল্যকালে নিজ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা পরিসমাপ্ত করে রাঙ্গুনিয়া আদর্শ বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক মানবিক বিভাগে অধ্যয়ন করেন। এতদ্‌সঙ্গে রাঙ্গুনিয়া রাজানগর সদ্ধর্মোদয় পালি টোল থেকে সূত্রপিটকের আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সূত্রবিশারদ উপাধি প্রাপ্ত হন। আমার বিদ্যালয়-জীবন ও মহাবিদ্যালয়-জীবন শেষে কর্ম-জীবনের বর্তমান শুভলগ্নে সাহাব্দী নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্ণ গঠন ও শিক্ষার মানোন্নয়নে তাঁকে পেয়েছি একজন সার্থক পথপ্রদর্শক রূপে।

তিনি রাঙ্গুনিয়া আদর্শ বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রায় চল্লিশ বৎসর শিক্ষকতা করে ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে অবসর প্রাপ্ত হন। শিক্ষকতার কাজে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি প্রায় বিশ বৎসর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদে এবং চট্টগ্রাম জর্জকোর্টের জুরারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিক্ষকতার কাজে

অবস্থানকালীন সময়ে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকটি বৌদ্ধ ধর্মীয় পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। তাঁর প্রণীত পাঠ্যবইগুলো পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত ছিল। তন্মধ্যে তাঁর প্রণীত মাধমিক ও উচ্চতর পালি ব্যাকরণ ও পালি অনুবাদ শিক্ষা' স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পালি টোলে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে তিনি **"চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস"** লিখেছেন্ এ গ্রন্থটি তাঁর জীবন সায়েহ্নের অন্তিম অবদান। এ গ্রন্থটি পাঠে তাঁর চিন্তা প্রসূত গভীর জ্ঞানের বহুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য অবগত হওয়া যায়। তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ এমন পূর্ণাঙ্গ ধরণের ইতিহাস ইতিপূর্বে আমার হাতে আর পড়েনি। এ গ্রন্থের সর্বত্রই গ্রন্থকার ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে তথ্য ও যুক্তির সহায়তায় স্বাধীনভাবে বিচার বিশ্লেষণ প্রয়াসী হয়েছেন।

শিক্ষকতার কাজ থেকে অবসর প্রাপ্তির পর বর্তমানে তিনি সাহাব্দী নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যকরী সংসদের সম্মানিত সহ-সভাপতির পদ অলংকৃত করছেন। বিদ্যালয়ের কার্যকরী সংসদের সদস্যবৃন্দ এবং বিদ্যোৎসাহীদের সহযোগিতায় এ উচ্চ বিদ্যালয়ের গঠনে সর্ব বিয়য়ে নিত্য নব জাগরণের আশাতীত সুনাম অর্জন করেছেন। পালি ভাষা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে 'বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক তাঁকে পালি ভাষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক পদে নিয়োগ দিয়েছেন। সমাজের পথ প্রদর্শক হিসাবে তিনি ন্যায় বিচারক, সদুপদেশ দাতা ও কঠোরে-কোমলে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে সদা যত্নবান ও সচেতন। কারো প্রতি অর্পিত দায়িত্ব যথাসময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন না হলে তাঁর প্রতিবাদী সিংহ-কণ্ঠ গর্জে উঠে। তখন নির্বাক অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে শুধু দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা ছাড়া বা অনেক ক্ষেত্রে তাঁর নজর থেকে সরে পড়া ছাড়া গত্যন্ত র থাকে না। কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তে তাঁর ভিতরের সহজ সরল পরোপকারী অনাড়ম্বর মিতব্যয়ী শান্তশিষ্ট লোকটিকে আবিষ্কার করতে মোটেই কষ্ট পেতে হয়না। নীহার, অমিয়, তুষার ও মৃনাল নামে তাঁর চারি পুত্র এবং সুজাতা ও দীপ্তি নামে তাঁর দুই মেয়ে। তারা সকলেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁর সহধর্মিনী প্রয়াত স্নেহলতা বড়ুয়া তাঁর উপরোক্ত সাহিত্য-কর্মে অনলস প্রেরণার উৎস ছিলেন। তিনি বিগত ২২শে মাঘ, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ, রোজ মঙ্গলবার এ পৃথিবীর সকল মায়ার বন্ধনকে উপেক্ষা করে ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল আত্মোন্নতি। আত্মোন্নতির উক্তিতে কেহ কেহ স্বার্থপরতার অভিযোগ আনতে পারেন; কিন্তু আত্মোন্নতি ও স্বার্থপরতা এক নহে। স্বার্থপরতা হচ্ছে পরের স্বার্থ নষ্ট করে নিজের স্বার্থ কামনা করা; আত্মোন্নতি হচ্ছে পরের স্বার্থের অনিষ্ট না করে নিজের উন্নতি সাধন করা। এই আত্মোন্নতি মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করে তাঁর কর্মজীবন শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পরিধিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের মূল আদর্শ ছিল এটিই ঃ-

"বহুমূল্য পরিচ্ছদ রতন ভূষণ,
নরের মহত্ত্ব নারে করিতে বর্ধন।
জ্ঞান পরিচ্ছদ আর ধর্ম অলংকার,
করে মাত্র মানুষের মহত্ব বিস্তার।"

এতাদৃশ সরল জীবন যাপনের আদর্শ গ্রহণে তিনি হয়েছেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাঁর নিরলস সমাজ

সেবা এবং তত্ত্ব ও তথ্য বহুল সাহিত্য কীর্তি অবিস্মরণীয়। এ গ্রন্থের সর্বত্রই তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে যুক্তির সহায়তার স্বাধীনভাবে বিচার-বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন বিধায় গ্রন্থটি লেখকের চিন্তা ধারার স্বাতন্ত্র্যে এবং স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। গ্রন্থ খানি আয়তনে ছোট, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যও চিন্তার সম্পদে নিঃসন্দেহে মূল্যবান। আশা করি তাঁর স্বরচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলোর ন্যায় এ গ্রন্থখানিও সুধী-পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করবে। পরিশেষে পরম করুণাময় বিধাতার শ্রীচরণে তাঁর নিরাময় সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

আশীবাদ প্রার্থী-
শ্রী মতি লাল বিশ্বাস
বি, এ, বি, এড্
প্রধান শিক্ষক,
সাহাব্দীনগর উচ্চ বিদ্যালয়
রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

মধ্য পারুয়া,
১৩ অক্টোবর, ১৯৮৬ ইংরেজী।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	চট্টগ্রামের মনুষ্যাবাসের সূচনা-	১
২।	চাক্‌মা-	১
৩।	চাক্‌মা রাজ বংশের পরিচয়-	৩
৪।	থেরবাদ বা হীনযান-	৯
৫।	সর্বাস্তিবাদ বা মহাযান-	১৬
৬।	দেববাদ বা তন্ত্রযান-	১৯
৭।	চট্টগ্রাম-	২৭
৮।	মগ-বড়ুয়া গোষ্ঠীর পরিচিতি-	৩১
৯।	মুচ্ছদী-তালুকদার-চৌধুরী শিকদার-সিং বা হিংস-হাজারী-	৩৮
১০।	অন্ধকার যুগে সমাজ সংস্কারকবৃন্দ এবং সংঘরাজ নিকায় প্রতিষ্ঠা-	৪০
১১।	মহাস্থবির নিকায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত-	৭০
১২।	পালি ভাষার উচ্চারণ-	৭৩
১৩।	ভারতীয় আদিলিপি আবিস্কার	৮২
১৪।	মাগধী প্রাকৃত হইতে বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি-	৮৫
১৫।	জাতীয় বৈশিষ্ট্য-	৯২

"নমো তস্স, ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স।"
(সেই ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার।)

চট্টগ্রামের মনুষ্যাবাসের সূচনা

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মহাভারতের যুগে চট্টগ্রামের পাহাড়গুলি সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়াছিল। কালক্রমে চট্টগ্রামে যতজাতি বসবাস করিয়া আসিতেছে, তন্মধ্যে 'তিবেতো বার্মানগণ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন জাতি।" সুদুর অতীতে সংখ্যাবৃদ্ধি, অনাবৃষ্টি ও প্রচণ্ড শীতের দরুণ তাহারা তিব্বত হইতে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর বাহিয়া চট্টগ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। আমাদের পাহাড়িয়া জাতিগুলির অধিকাংশই 'তিবেতো বার্মান'। তাহাদের আকার মধ্যম, শরীর সবলও ঈষৎ গৌরবর্ণ, নাসিকা চেপ্টা। তাহারা শ্মশ্রুবিহীন, সবল ও স্বাবলম্বী।

চাকমা

কপিলবাস্তুর শাক্যরাজগণ ছিলেন কোশলরাজের অধীনে সামন্ত রাজা। কথিত আছে, কোশলরাজ প্রসেনজিতের পুত্র বিড়ূর * ষোড়ষবর্ষকালে।

মহাসমারোহে মাতুল শাক্যরাজবংশে সর্বপ্রথম বেড়াইতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে জানিতে পারিলেন যে তাঁহার মাতা বাসব ক্ষত্রিয়া ছিলেন দাসীর মেয়ে। তখন এই ঘটনাটি জানিয়া তিনি দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিলেন যে রাজ সিংহাসন আরোহণের পর শাক্যবংশ সমূলে ধ্বংস করিবেন। বাসব ক্ষত্রিয়া ছিলেন পরিনির্বাণ প্রাপ্ত শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের ভ্রাতা

---

* বিড়ূব, 'ভদ্দসাল জাতকের পচ্চুপন্নবত্থু' ঈশান ঘোষের অনুদিত জাতকের সংখ্যা -৪৬৫।}-দ্রষ্টব্য।

শুক্লোদনের জৈষ্ঠ্য পুত্র শাক্যরাজ মহানামের ঔরষে নাগমুণ্ডা দাসীর গর্ভজাত রূপগুণ সম্পন্ন মেয়ে। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হইলে বিপুল সৈন্য সহকারে শাক্যবংশ সমূলে ধ্বংস করার মানসে তাঁহার নিষ্ঠুর বিভীষিকাময় আক্রমণে এবং শাক্যজাতির উপর অমানুষিক নির্যাতনের ফলে সেই সময়ে কপিলবাস্তু হইতে প্রাণভয়ে পলায়মান বাস্তুহারা শাক্যজাতি বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে।

সূর্যবংশ হইতে শাক্যজাতির উৎপত্তি। এই শাক্যজাতির আদি। বাসস্থান কপিলবস্তু হইতে ক্রমে ক্রমে বহু দেশ দেশান্তরে বসতি স্থাপন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে চম্পক নগরে বাস করিতে থাকে। এই চম্পক নগর বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত এবং চট্টগ্রামের নিকটবর্তী ছিল। কালক্রমে এই শাক্যজাতি শক্তিশালী হইয়া উঠে। কথিত আছে, চম্পক নগরের রাজা উদয়গিরির, বিজয়গিরি ও সমরগিরি নামে দুই পুত্র ছিল। তাঁহার সেনাপতির নাম ছিল রাধামোহন। বিজয়গিরি ও রাধামোহন সহ মগধ রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তিনি এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। উদয়গিরির মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সমরগিরি সিংহাসনে আরোহন করেন। এই চম্পক নগরের অধিবাসীরাই চাকমা। চম্পক হইতে চাকমা জাতির উদ্ভব হইয়াছে। আবার কোন কোন পণ্ডিতের অভিমত, আরকানীরা শাক্যবংশকে 'চাকমাং' বলিত। চাক্ শব্দের অর্থ শাক্য এবং মাং শব্দের অর্থ রাজবংশ। কালক্রমে এই চাকমাং রূপান্তরিত হইয়া 'চাকমা' হইয়াছে। এখনও চাকমারা স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হইয়া বিচ্ছিন্ন হইতে দেখা যায়। চাকমা ভাসায় প্রাচীন মাগধী ও বাংলা ভাষায় বিকৃত সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এইজন্য চাকমা ভাষাকে বাংলা ভাষায় অপভ্রংশ বলা চলে। ইহাতেই বুঝা যায় যে চাকমারাই বাঙ্গালীদের অধিকতর সংস্পর্শে আসিয়াছে।

চাকমা রাজবংশের পরিচয়

চাকমা রাজারা মোগল শাসনকালে 'খাঁ, রায়' এবং মেয়েদের জন্য 'বিধি' উপাধি গ্রহণে গৌরব অনুভব করিতেন। এই জন্য বাঙ্গালী ও মুসলমানী ভাবধারায় চাকমা রাজাদের মধ্যে সংমিশ্রিত নাম পরিদৃষ্ট হয়। কালক্রমে মেয়েদের উপাধি 'বিবি' নাম হইতে 'বি' হইয়াছে।

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজা সেরমুস্ত খাঁর রাজত্বকালে চট্টগ্রাম জেলার সমস্ত পার্বত্য অংশ তাঁহার অধিকারে ছিল। তাঁহার রাজ্য সীমা ছিল উত্তরে ফেণী নদী, দক্ষিণে শঙ্খ নদীর মধ্যবর্তী স্থান, পূর্বে লুসাই পাহাড়, পশ্চিম নিজামপুর রাস্তা অর্থাৎ বর্তমান ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ কোম্পানীর কালেক্টর মিস্টার হেনরী ভোরলেস্টের বিবরণ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম গেজেটেও পূর্বোক্ত সীমানা পরিদৃষ্ট হয় এবং সীতাকুণ্ড পাহাড়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। চাকমা রাণী কালিন্দী তথায় সেই স্থানের যাবতীয় খাজানা গ্রহণ করিতেন। চট্টগ্রাম শহরের রাণীর দীঘি, রাজাপুর লেইন, দেওয়ান বাজার প্রভৃতি আজিও চাকমাদের স্মৃতি বহন করে। আরকানীদের অত্যাচারে চাকমা রাজা সেরমুস্ত খাঁ মোগল নায়েবের সঙ্গে মিত্রতা করেন এবং শুল্ক প্রদানের স্বীকৃতি প্রদান করেন। মোগল শাসনকালে চাকমা রাজারা ছিলেন করদরাজন্যবর্গ। চাকমা রাজাগণ রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। সেই সময়ে চাকমা রাজা সেরমুস্ত খাঁর রাজধানী ছিল দক্ষিণ চট্টগ্রামের মাতা মুহুরী নদীর নিকটবর্তী আলি কদম। আজিও তথায় রামুর নিকটবর্তী চাকমাদের বহু স্মৃতি চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়; যেমন ঃ- চাকমা কুল, চাকমা বিল, চাকমা পাড়া ইত্যাদি, যদিও বর্তমানে উক্ত অঞ্চলে কোন চাক্মা বসতি নাই। রাজা সেরমুস্ত খাঁর পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁহার ভ্রাতা

ওরমুস্ত খাঁর পুত্র শুকদেব রায়কে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। রাজা সেরমুস্ত খাঁর মৃত্যুর পর শুকদেব রায় রাজা হন। রাজা শুকদেব রায় পূর্ব রাজধানী আলিকদম ত্যাগ করিয়া চাকমা অধ্যুষিত রাঙ্গুনিয়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের শিলক নদীর নিকটবর্তী স্থানে একটি মনোহর প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া সেই স্থান 'শুকবিলাস' নাম প্রদানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা শুকদেব রায় হিন্দু ধর্মের প্রতিও উদার ছিলেন। ত্রিপুরার মহারাজ চাকমা রাজা শুকদেব রায়ের কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হইয়া সম্প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে কয়েক ঘর ত্রিপুরা প্রজা প্রদান করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজা শুকদেব রায় ছিলেন মোগল আমলের শেষ রাজা। তিনি রাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত চাকমা সর্দার ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে সর্বপ্রথম 'দেওয়ান' উপাধি প্রদান করেন। সেখানেও অদ্যাবধি চাকমা রাজবংশের বহু স্মৃতি চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়; যেমন-শুকদেব তরফ রাজার দীঘি, রাজ বিলি, শুকবিলাস ইত্যাদি। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবর নবাব মীর কাশেম চট্টগ্রামের শাসনদণ্ড ইংরেজদের হস্তে অর্পণ করেন। এই ইংরেজ আমলে শাসনের সুবিধার জন্য ভৌগোলিক দুরত্বের দরুণ চট্টগ্রামকে দুই অঞ্চলে ভাগ করিয়া এক ভাগের নাম চট্টগ্রাম, অপর ভাগের নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে অভিহিত করা হইল। রাজা শুকদেব রায়ের মৃত্যুর পর ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র সেরদৌলত খাঁ রাজ্য ভার প্রাপ্ত হন। রাজা সেরদৌলত খাঁ বৃটিশ কোম্পানী আমলের প্রথম চাকমা রাজা। তিনি বৃটিশ কোম্পানীর কর বন্ধ করেন এবং নানা উপদ্রব ছিলেন। তিনি স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিতেন। রাজা সেরদৌলত খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জানবক্স খাঁ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। তাঁহার সময়েও বৃটিশ কোম্পানীকে খাজনা প্রদান করিলেন না। ইহার প্রতিকারার্থে আবার বৃটিশ কোম্পানী সেই বৎসর তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। রাজা জানবক্স খাঁ নিরুপায় হইয়া

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস'এর সমীপে; ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বৃটিশ কোম্পানীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। রাজা জানবক্স খাঁ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং নানাবিধ অসুবিধার দরুণ তাঁহার সময়ে শুকবিলাস হইতে রাঙ্গুনিয়া উপজেলার চাকমা অধ্যুষিত রাজানগরে আবার রাজধানী পরিবর্তন করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর টব্বর খাঁ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে রাজানগরে সাগর দীঘি খনন করা হয়। নিঃসন্তান রাজা টব্বর খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভাতা জব্বর খাঁ ১৮০২ খৃষ্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রাজা জব্বর খাঁর মৃত্যুর পর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র ধরমবক্স খাঁ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রাজা ধরম বক্স খাঁ তাঁহার সময়ে রাঙ্গামাটি মৌজার বর্তমান জলমগ্ন পুরাতন বস্থি গ্রামে রাঙ্গুনিয়া উপজেলা হইতে তাঁহার বহু প্রজাবৃন্দ আনিয়া এই জেলায় সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। চাকমারা জুম করিয়া স্থান পরিত্যাগ করিলে পরিত্যক্ত স্থানকে চাকমা ভাষায় বলা হয় রান্যা। এই রান্যার অপভ্রংশ রাউন্যা শব্দ হইতে রাঙ্গুনিয়া শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। রাজা ধরমবক্স খাঁর কালিন্দী, আটকবি ও হারিবি নামে তিন রানী ছিল। কালিন্দী ও আটকবি নিঃসন্তান ছিলেন। হারিবিরগর্ভে মেনকা ওরফে চিকনবী নামে এক মেয়ে ছিল। তাঁহার সুশাসন গুণে প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে 'ধরম বক্স মহারাজ' বলিত। রাজা ধরমবক্স খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পতিব্রতা ধর্মপরায়না প্রথমা পত্নী কালিন্দী রাণী মহোদয়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তৎপর যথাসময়ে রাজানগর রাজপ্রাসাদে রাজোচিত মর্যাদায় মহাসমারোহে চিকনবির সঙ্গে গোপীনাথ দেওয়ানের বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হয়। চিকনবীর গর্ভে হরিশ্চন্দ্রের জন্ম হয়। চাকমা রাজাদের মধ্যে কালিন্দী রাণীর সময়টি ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বিবরণ হইতে জানা যায়, রাণী কালিন্দী

বিবিধ সদ্‌গুণের অধিকারিনী ও রাজনৈতিক দুরদর্শিতায় তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। রাণী কালিন্দীর সময়ে সক্রিয়ভাবে এই জেলায় বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত হয় এবং ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষারও প্রথম সূত্রপাত হয়। তিনি লুসাই অভিযানের সময় বৃটিশ সরকারকে বিশেষরূপে সাহায্য করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন কল্পে বৃটিশ সরকার কর্তৃক মোজা বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে হেডম্যান ও রোয়াজা পদ সৃষ্টি করিয়া মৌজার অধিবাসীগণ কর্তৃক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয় এবং পরে চাকমা রাজা কর্তৃক অনুমোদিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তাঁহারা জুম টেক্স আদায় করিবেন এবং মৌজার আভ্যন্তরীণ সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিবেন। তখন ক্যাপ্টেন লুইন ছিলেন এই বৃটিশ অধিকারের প্রাধান্য লাভের প্রতিষ্ঠাতা। চাকমা রাজাদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট আবার পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলাকে তিন সার্কেলে বিভক্ত করার বিষয় ঘোষণা করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে হইতে এই জেলায় এসিস্টেন্ট কমিশনার হইলেন শাসনকর্তা। এক সময়ে কেপ্টেন লুইন কালিন্দী রাণীর সঙ্গে রাজানগর রাজপ্রাসাদে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। ইহাতে কেপ্টেন লুইন অতিশয় কুপিত হন। আর একবার তিনি মহামুনি মেলার সময়ে রাজানগরে রাজপ্রসাদে রাণীর সঙ্গে জোর করিয়া সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিলে রাণীর অনুচরবর্গ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। এরূপ জনরব আছে যে ইহা জানিতে পারিয়া ফিরিবার পথে বাঙ্গালী ও চাকমারা তাঁহাকে রাস্তায় অপমান কর্ণফুলী নদীর শুল্ক ও ইছামতি নদীর শুল্ক বরাবরই চাকমা রাজাদের অধীনে ছিল। কর্ণফুলী নদীর শুল্ক চন্দ্রঘোণায় এবং ইছামতী নদীর শুল্ক ইছামতী নদীর মোহনায় ঘাটঘরে চেক করিয়া আদায় করা হইত। ইহাও কেপ্টেন লুইনের সময় বৃটিশ সরকারের কর্তৃত্বাধীনে নিয়া আসে। পার্বত্য চট্টগ্রাম

জেলার উত্তরাংশ চাকমা রাজার অংশ হইতে পৃথক ভাবে নুতন সার্কেল নামে বিভক্ত করিয়া উহাতে মং চীফ উপাধীতে ক্যজচাঁই চৌধুরীকে নতুন রাজ পদ দিয়া স্বতন্ত্র মাণরাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলার দক্ষিণাংশ চাকমা রাজার অংশ হইতে পৃথক সার্কেলে বোমাং বংশের মং প্রুকে নুতন রাজপদ দিয়া স্বতন্ত্র বোমাং রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহাও কেপ্টেন লুইনের সময় ইহার জন্য রানী কালিন্দী আপীল করেন। তাঁহার আপীল ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অগ্রাহ্য করা হয়। ইহার পর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে মং সার্কেল, বোমাং সার্কেল ও চাকমা সার্কেল এই তিন সার্কেলে বিভক্ত করার বিষয় ঘোষণা করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে হইতে এই জেলায় এসিস্টেন্ট কমিশনার হইলেন শাসনকর্তা।

কালিন্দী রাণীর মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র হরিশ্চন্দ্রকে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার 'রাজা' উপাধি প্রদানে রাজ্যভার প্রদান করেন। রাজা হরিশ্চচন্দ্রও লুসাই অভিযানে বৃটিশ সরকারের বিশেষ সাহায্য করেন। তাহাতে তিনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি এবং ১,৫০০ (দেড় হাজার) টাকা মূল্যের সোনার ঘড়ি ও সোনার চেন উপহার প্রাপ্ত হন। তদানিন্তন লেপ্টেনেন্ট গভর্ণরের আদেশে এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারে নির্দেশে রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর পাহাড়ী চাকমাদের রাজা বলিয়া রাজানগর হইতে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে আবার রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হন। তৎপর রাজা হরিশ্চন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নবচন্দ্র দেওয়ান ব্যতীত অন্যান্য সকলেই নিজ নিজ সুবিধানুযায়ী স্থানে বসতি স্থাপন করেন। আজিও নবচন্দ্র দেওয়াদের ভাবী বংশধরগণ রাজানগর রাজপ্রসাদে বসবাস করিতেছেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র যুবরাজ ভুবন মোহনের বিবাহ উৎসবও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ তারিখে মহাসমারোহে রাজানগর রাজপ্রাসাদে সুসম্পন্ন হয়। রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র

ভুবন মোহন রায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় সহকারী কমিশনার মিস্টার ডেলিডিন মহোদয় রাঙ্গামাটি রাজপ্রাসাদে মহাসমারোহে তাঁহাকে রাজ্রপদে অভিষিক্ত করেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর বেলভিদিয়া প্রাসাদে লেপ্টেনেন্ট গভর্ণর সারজন উড্‌বরণ চাকমা রাজা ভুবন মোহান রায়কে 'খেলাৎ' উপাধিঃ প্রদান করেন। তৎপর রাজা ভুবন মোহন রায় স্থায়ীভাবে নতুন রাজধানী রাঙ্গমাটিতে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি এখানে পূর্বের চাক্‌মা রাজপ্রাসাদ নূতন ভাবে নির্মাণ করেন এবং বুদ্ধগয়া মন্দিরের অনুকরণে গৌতমমুনি মন্দির নামে এক সুবৃহৎ বুদ্ধ-মন্দির ও বৌদ্ধ-বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সকল পূর্বস্মৃতি সমস্তই কর্ণফুলী বাঁধের জলে নিমজ্জিত হইয়াছে। রাজা ভুবন মোহনরায়ের মৃত্যুর পর ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র নলিনাক্ষ বিভাগীয় কমিশনার মিস্টার টুইনাম মহোদয় কর্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারত সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের জন্মদিবস উপলক্ষে সম্রাটের জয়ন্তীতে নলিনাক্ষ রায়কে 'রাজা' উপাধি প্রদান করা হয়। তাঁহারই উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র পত্রিকা 'গৈরিকা' এক সময়ে পরিচালিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র ত্রিদিব রায় পুরাতন রাঙ্গামাটী রাজ প্রাসাদে মহাসমারোহে বিভাগীয় কমিশনার পীর আসান উদ্দীন মহোদয় দ্বারা রাজ গর্দিতে অভিষিক্ত হন। তিনি স্বাধীন পাকিস্তানে প্রথম রাজা। তাঁহার রাজত্বকালে হাইড্রোইলেক্‌র্টিসিটির জন্য কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়। তিনি পাকিস্তান সরকার হইতে 'মেজর' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময়ে নূতন রাঙ্গামাটীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। সেই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান উভয় অংশই পাকিস্তান নামে অভিহিত হইত। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হইয়া

বাংলাদেশ নামে অভিহিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেজর রাজা ত্রিদিব রায় জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া আগেকার পশ্চিম পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তৎপর তাঁহার পুত্র দেবাশীষ রায় ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিষ্টার আব্দুল আওয়াল কর্তৃক নূতন রাঙ্গামাটির রাজ প্রাসাদ রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম চাকমা রাজা। তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহার পিতামহী রাণী বিনীতা রায় এক সময়ে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতিমন্ত্রী পদও অলংকৃত করেন।

থেরবাদ বা হীনযান

মারবিজয়ী ভগবান বুদ্ধের জীবমান কালে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধরাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিত, মহাধনবান শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ, ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা এবং মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ বিশাখা, খ্যাতনামা চিকিৎসক জীবক প্রভৃতি ভগবান বুদ্ধের ত্রিশ ত্রিশরণ মন্ত্র (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের আশ্রয়) গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বিশেষ সাহায্য করেন।

"বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি" ভগবান বুদ্ধ এই ত্রিশরণ মন্ত্র প্রচার করেন এবং সংঘশক্তির উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সম্বোধিলাভের পর বারাণসী জেলার সারনাথে সর্বপ্রথম ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস পরিসমাপ্তির পর ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে ধর্মপ্রচারের জন্য এইরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বহুজনের হিতের জন্য ও সুখের জন্য এবং দেব-মনুষ্যগণের কল্যাণের জন্য চারিদিকে গিয়া ধর্ম প্রচার কর; কিন্তু এক পথে দুই জন যাইওনা।" তিনি আরও নির্দেশ দিয়াছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ধর্ম দেশনা কর, –যাহার আদিতে কল্যাণ, শীল

অর্থাৎ চরিত্র গঠন মূলক নীতি, মধ্যে কল্যাণ, সমাধি অর্থাৎ ষড়েন্দ্রিয় হইতে সংযত হইয়া চিত্তের একাগ্রতা বাধন এবং অন্তে কল্যাণ, প্রজ্ঞা অর্থাৎ চতুরার্যসত্য-নামরূপ-প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ। ধর্মপ্রচার করিতে এক পথে দুইজন যাইওনা" ভগবান বুদ্ধের এই নির্দেশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থযুক্ত। এক এক জনপদে কেবলমাত্র একজন ভিক্ষু গিয়া বিবিধ প্রতিকুলতার মাধ্যমে সেই বলে পদের লোকদিগকে কিরূপে সদ্ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। কিরূপ চরিত্রবান, আদর্শ পরায়ন এবং মৈত্রীভাবাপন্ন হইলে সম্ভব হইবে, তাহা উপলব্ধির জন্য "মজ্ঝিম নিকায়ের পুন্নোবাদ" সূত্র হইতে সুনাপরন্ত জনপদে ভিক্ষুপুর্ণের সদ্ধর্ম প্রচারের বৃত্তান্ত হইতে বুঝা যাইবে।

ভিক্ষু পূর্ণ সুনাপরন্ত (সীমান্তবর্তী) জনপদে ধর্ম প্রচারের স্থান নির্বাচন করিয়া ভগবান বুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন,-"সেই স্থানের জনগণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও কর্কশভাষী। তাহারা তোমার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলে বা দুর্বাক্য ব্যবহার করিলে তোমার মনের ভাব কিরূপ হইবে?" পূর্ণ উত্তর করিলেন-"তখন আমার মনে হইবে যে সুনাপরন্তবাসী জনগণ ভদ্র, অতিশয় ভদ্র, যেহেতু তাহারা আমাকে হস্তদ্বারা প্রহার করে নাই।" ভগবান বুদ্ধপুনরায় বলিলেন,-"যদি তাহারা হস্তদ্বারা তোমাকে প্রহার করে? তখনও মনে করিব, তাহারা ভদ্র, অতিশয় ভদ্র, যেহেতু তাহারা হস্ত দ্বারা প্রহার করিয়াছে, লোষ্ট্রদ্বারা প্রহার করে নাই।" পুনরায় ভগবান বুদ্ধ বলিলেন,-"যদি তাহারা লোষ্ট্র দ্বারা তোমাকে প্রহার করে? তখনও মনে করিব, তাহারা ভদ্র, অতিশয় ভদ্র, যেহেতু তাহারা দণ্ডদ্বারা প্রহার করে নাই।" আবার ভগবান বুদ্ধ বলিলেন,-"যদি তাহারা দণ্ডদ্বারা তোমাকে প্রহার করে? তখনও মনে করিব, তাহারা ভদ্র, অতিশয় ভদ্র, যেহেতু তাহারা সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা আঘাত করে নাই।"

সর্বশেষে ভগবান বুদ্ধ প্রশ্ন করিলেন,-"সুনাপরন্তবাসী জনগণ তোমাকে তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিতে করিতে যদি হত্যা করে, মৃত্যুকালে তোমার মনের ভাব কিরূপ হইবে?" পূর্ণ উত্তর করিলেন,-"ভগবান" তখন আমার মনে হইবে, তাহারা ভদ্র, অতিশয় ভদ্র, আমরা যেই দেহমূল দ্বারা মলিন হইয়া শেষ হইয়া

যাইত, সেই দেহকে ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত ধর্ম প্রচারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারায় তাহারা আমার মহোপকার সাধন করিয়াছে। আমি পূর্ণ মৈত্রীতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই দেহ ত্যাগ করিতে পারিব।" ভগবান বুদ্ধ অভিনন্দন করিয়া বলিলেন, -"সাধু সাধু পূর্ণ (অতি উত্তম, অতি উত্তম পূর্ণ)। তুমি এইরূপে সংযম ও উপশম দ্বারা সুনাপরন্ত জনপদে ধর্ম প্রচার করিতে পারিবে।" কিন্তু সত্য সত্যই বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইলেও ভিক্ষু জন পদে ধর্মপ্রচারে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছিলেন। এইরূপে ভিক্ষুগণ আর্যধর্মে ও পূর্ণ মৈত্রীতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিপুল বাধাবিপত্তির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা বুদ্ধের ধর্মবিজয়ের এই দুইটি মূলমন্ত্র অধিগত করিয়াছিলেন,-

"যো সহস্সং সহস্সেন সঙ্গামে মানুসেজিনে,
একঞ্চ জেয়্যমত্তানং স বে সঙ্গামে জয়মুত্তমো ।"-ধম্মপদ

যদি কেহ যুদ্ধে সহস্রগুণ ব্যক্তিকে জয় করে এবং অপর কেহ কেবল আপনাকে জয় করে, তাহা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তিই সংগ্রামে জয়শীল ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

"অক্কোধেন জিনে কোধং, অসাধুং সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিয়ং দানেন, সচ্চেন অলিক বাদিনং।"- ধম্মপদ

ক্রোধকে অক্রোধবলে জয় করিবে, অসাধুকে সাধুতাবলে হয় করিবে, কৃপণকে দানবলে জয় করিবে এবং মিথ্যাবাদীকে সত্যবলে জয় করিবে।

ঋষি ও মনীষী প্রখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সাম্য নামক প্রবন্ধ-পুস্তকে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ-

"ভগবান বুদ্ধ ছিলেন পৃথিবীতে প্রথম সাম্য-সংস্থাপক, মানুষে-মানুষে কৃত্রিম বৈষমের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম তিনিই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন।"

ভগবান বুদ্ধের এই অনুশাসন প্রাপ্ত হইয়া বৌদ্ধভিক্ষুগণ একদিকে নেপাল, তিব্বত, চীন, মহাচীন, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, তাতার ও জাপানে; অন্যদিকে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, লাউস ও কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে; পশ্চিমে গ্রীস, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে সদ্ধর্মের অমৃতবাণী প্রচারে করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের খৃষ্ট পূর্ব ২১৮ বৎসর পরে সম্রাট অশোক ভিক্ষু উপগুপ্তের উপদেশে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ভগবান বুদ্ধের জীবমান কাল হইতে ভারতের (বর্তমান বাংলাদেশ-পাক-ভারত রাষ্ট্রের) বৌদ্ধসম্রাট ধর্মাশোকের ধর্ম প্রভাব বিস্তার কাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মকে থেরবাদ নামে অভিহিত করিত। ইহার স্থিতিকাল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টপুর্ব প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত। ধর্মাশোক ভারতে বৌদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধদের এক অবিস্মরণীয় গৌরবময় অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। এক সময়ে মহারাজ অশোক ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়া জিজ্ঞাসাবাদে জানিতে পারিলেন যে ভগবান বুদ্ধের দেশিত উপদেশ বাণীর পরিমাণ চুরাশী হাজার ধর্মস্কন্ধ। সেই সময়ে ভারতের চুরাশী হাজার নগর ছিল। ভগবান

বুদ্ধের প্রত্যেক ধর্মস্কন্ধের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ ছিয়ানব্বই কোটি ধনব্যয়ে প্রত্যেক নগরে তিন বৎসরের মধ্যে একটি বিহার ও একটি ধাতু চৈত্য নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। আর ষাট হাজার ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকের দান উচ্ছেদ করিয়া তদস্থলে ষাট হাজার ভিক্ষুর নিত্য ভোজনের ব্যবস্থা করা হইল। এতদ্‌ভিন্ন ভারতের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় শিক্ষার কেন্দ্রস্থান গড়িয়া তোলেন, স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় ও পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন করেন এবং পথিকদের বিশ্রামের জন্য রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিবিধ বৃক্ষরাজি রোপন করেন। আরও তিনি বুদ্ধের উপদেশাবলী ক্ষোদিত করেন শিলাস্তম্ভে ও পর্বতগাত্রে। মহারাজ ধর্মাশোকের অর্থানুকুল্যে শাসন বিশোধন করিবার মানসে মগধের রাজধানী পাটলি পুত্রে খৃষ্ট ২৫৩ অব্দে তদানীন্তন সংঘনায়ক মৌৎগলি পুত্র-তিষ্য মহাস্থবিরের নেতৃত্বে এক ধর্ম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই ধর্মসংগীতিতে বৌদ্ধধর্ম পালিভাষায় ব্রাহ্মী অক্ষরে সমগ্রত্রিপিটক শাস্ত্র সর্বপ্রথম তালপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এই 'থেরবাদ' প্রচার করিবার জন্য ভারতের ভিতরে ও ভারতের বাহিরে বিভিন্ন প্রচারক ভিক্ষুসংঘ বিভিন্ন দিকে প্রেরিত হয়। তিনি বৌদ্ধধর্মকে রাজধর্ম এবং বৌদ্ধদিগকে রাজবংশ বলিয়া ঘোষণা করেন। সেই সময়ে এই বাংলাদেশ পাক-ভার রাষ্ট্র, বৌদ্ধভারত নামে অভিহিত হয়। আরও তিনি পঞ্চশীলকে রাজ্যশাসনের আইনে পরিণত করেন। ইহা দীঘনিকায়'এর মহাসুদর্শনসূত্রে ও চক্রবর্তী সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই ভাবে মহারাজ ধর্মাশোক কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশ-পাক-ভারতরাষ্ট্রে ও বহির বাংলাদেশ-পাক-ভারতরাষ্ট্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ প্রেরণা হইতে প্রাচীন বৌদ্ধসমাজে শিল্পকলার উদ্ভব হইয়াছিল, যেমনঃ-অজন্তাগুহা, সপ্তপর্ণি গুহা, সাঁচিস্তূপ, অশোকস্তম্ভ, শিলালিপি ইত্যাদি। এই শিল্পকলা ছিল জাতীয় ধর্ম জীবনের প্রবল শ্রদ্ধার মহান জীবনী শক্তি।

ভারতের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া বর্হিভারতে বৌদ্ধধর্মের অমৃতবাণী প্রচারের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোকের নেতৃত্বেই প্রথম আরম্ভ হয়। সেই সময়ে সম্রাট অশোক উদাত্তকণ্ঠে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ভগবান বুদ্ধকে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন, আর ভগবান বুদ্ধের বাণীকে যিনি জীবনে গ্রহণ করিয়া তাঁহার রাজ শক্তিকে দেশ মঙ্গলের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসের সেই মহান নায়ক অশোককে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রাগ্ বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ বর্হিজগৎ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। বৌদ্ধ যুগেই সর্বপ্রথম এই বিচ্ছিন্নতা দূরীভূত হয়। ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষুগণ সধর্ম প্রচারের জন্য বিদেশে গমন করেন এবং বিদেশ হইতে শিক্ষার্থী ও পরিব্রাজকবৃন্দের সধর্মে শিক্ষালাভ ও তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে ভারতে আগমন, এই দ্বিবিধ কারণে বহির্জগৎ হইতে ভারতের বিচ্ছিন্নতা বিলুপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম বর্হিজগতে গমনাগমনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। বৌদ্ধধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্যগুণ হইল এই,-বিভিন্ন নদীর জল সমুদ্রে পতিত হইলে যেমন সমুদ্রের লবনাক্ত রসে এক রসযুক্ত হইয়া যায় এবং কোন প্রকার বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয় না, সেরূপ বিভিন্ন জাতি ভগবান বুদ্ধের সধর্মে অন্তর্ভূক্ত হইলে সকলেই বৌদ্ধ নামে পরিচিত হয় এবং কোন প্রকার বিভিন্নতা থাকে না। সর্বজাতীয় সমন্বয় প্রথা অহিংসা মন্ত্র ভগবান বুদ্ধই সর্বপ্রথম প্রচার করেন। বৌদ্ধ সমাজে জাতিবেদ ও কৌলিন্য প্রথা নাই। কেবল স্বকীয় গুণ-প্রভাবেই মানব আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই অহিংসা মন্ত্রের থেরবাদই প্রাচীন বুদ্ধমত। এই থেরবাদে অগ্রশ্রাবকদ্বয় ধর্ম সেনাপতি সারিপুত্র ও মহাঋদ্ধিবল সম্পন্ন মৌদ্গল্যায়ণ, প্রথম ধর্ম সঙ্গীতি পরিচালক ধুতাঙ্গধারী শ্রেষ্ঠ সংঘনায়ক মহাকস্যপ, ধর্মধর আনন্দ,

বিনয়ধর উপালি, লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলী, মিলিন্দ প্রশ্নের সমাধান কর্তা নাগসেন, ত্রিপিটকের অর্থকথা লেখক বুদ্ধঘোষ, পালিভাষার সর্বপ্রথম ব্যাকরণ লেখক কচ্চায়ন, দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতি পরিচালক সংঘনায়ক মহাষশ, তৃতীয় ধর্ম সঙ্গীতি পরিচালক সংঘনায়ক মৌদ্গলিপুত্র তিষ্য, সিংহলে প্রথম ধর্ম প্রচারক মহীন্দ্র ও সংঘমিত্রা, ব্রহ্মদেশ ও থাইল্যাণ্ডে (শ্যামরাজ্যে) প্রথম ধর্ম প্রচারক সোন-রেবত-উত্তর, সুনাপরন্তরাজ্যে পুর্ণ, যোনক রাজ্যে মহারক্ষিত, বনবাসী রাজ্যে যোনক রক্ষিত, অপরান্ত রাজ্যে ধর্মরক্ষিত, কাশ্মীর ও গান্ধার রাজ্যে মধ্যন্তিক, মহিংসক মণ্ডলে মহাবেরত, মহারাষ্ট্রে মহাধর্মরক্ষিত, হিমালয় ও চীন সাম্রাজ্যে মধ্যম স্থবির প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ধর্মবিজয়ী অরহত ভিক্ষুদের ধর্মপ্রচারে থেরবাদী অত্যোজ্জ্বল প্রভাব বিস্তার লাভ করে। আর এহ থেরবাদ বা বুদ্ধমতকে মহাযান সম্প্রদায় কর্তৃক বলা হয় হীনযান। ভগবান বুদ্ধের দেশিত চতুরার্য সত্যে যথাযথ জ্ঞানলাভে ও তৃষ্ণাক্ষয়ে স্বয়ং নির্বাণ প্রাপ্ত হয় বলিয়া এরূপ নাম দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। থেরবাদ স্থিতির জন্য নিম্নোক্ত স্থান সমূহে ছয়টি ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। যথা ঃ- ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিনমাস পরে মগধরাজ অজাতশত্রুর অর্থানুকুল্যে রাজগৃহের সপ্তপর্ণিগুহায় মহাকশ্যপ মহাস্থবিরের নেতৃত্বে প্রথম ধর্মসঙ্গীতি, শত বৎসর পরে মহারাজ কালাশোকের সাহায্য বৈশালী নগরে মহাযশ মহাস্থবিরের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতি, ২৩৫, বৎসর পরে ভারত সম্রাট ধর্মাশোকের উদার বদান্যতায় পাটলিপুত্রে মৌদ্গলিপুত্রতিষ্য মহাস্থবিরের নেতৃত্বে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি, বুদ্ধের পরিনির্বাণ প্রাপ্তির পর ৪৫০ বর্ষে লঙ্কাদ্বীপে রাজা বট্টগামনির সহায়তায় মাতুল জনপদের আলোকলেনে মহাধর্মরক্ষিত মহাস্থবিরের নেতৃত্বে চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি, ২৪১৫ বুদ্ধাব্দে ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ের রতনপুঞ্জে ব্রহ্মরাজ মিনডৌনের সাহায্যেভদন্ত জাগর মহাস্থবিরের নেতৃত্বে পঞ্চম

ধর্মসঙ্গীতি এবং ২৫০০ বুদ্ধাব্দে রেঙ্গুনের নিকটবর্তী শ্রীমঙ্গল নামক স্থানে ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী থাকিন উৎ নূ প্রমুখ শাসন পরিষদের সদস্যবৃন্দের সাহায্যে ভদন্ত রেবত মহাস্থবিরের নেতৃত্বে ষষ্ঠ ধর্মসঙ্গীতি সংগঠিত হয়।

সর্বাস্তিবাদ বা মহাযান

থেরবাদের পর কালক্রমে মহাযান সম্প্রদায় প্রবল হইয়া উঠে। বোধিসত্বের জীবন চরিত্রের অনুকরণে পারমিতা সমূহ (বোধিজ্ঞান লাভের উপকরণ সমূহ, যথা-দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী, উপেক্ষা-এই দশবিধ পারমী) পরিপূর্ণ করিয়া বোধিজ্ঞান লাভে সম্যক সম্বুদ্ধ হইয়া নিজেও নির্বাণ প্রাপ্ত হন এবং অন্যান্যকেও নির্বাণ লাভ করিতে উপদেশ প্রদান করেন,–ইহাই হইল মহাযান সম্প্রদায়ের আদর্শ বোধিসত্ববাদ। এই সময়ে বাংলাদেশ পাক-ভারত রাষ্ট্রের মহাযান সম্প্রদায়ের কেবল মাত্র একটি সঙ্গায়ন বৌদ্ধ সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে তাঁহারই অর্থানুকুল্যে বাংলাদেশ-পাক ভারত রাষ্ট্রপতি পাঞ্জাবের জালন্ধরে ৭৮ খৃষ্টাব্দে আচার্য বসুমিত্রের পৌরোহিত্যে মহাযান সম্প্রদায়ের একটি ধর্মসঙ্গতি অনুষ্ঠিত হয়। এই ধর্মসঙ্গীতিতে পালি ভাষার ত্রিপিটকশাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় পরিবর্তিত হয়। এই সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের নাম সর্বাস্তিবাদ সর্বাস্তিবাদই নবীন বৌদ্ধমত। ইহার স্থিতিকাল প্রথম শতাব্দী হতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত। বুদ্ধের পরিনির্বাণের চারিশত বৎসর পরে মহারাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে সর্বপ্রথম বুদ্ধিমূর্তি নির্মিত হইয়াছে। সেই সময়ে সার্বস্তিবাদী ভিক্ষুদের মধ্যে শুন্যবাদ কারিকা ছন্দের প্রবর্তক নাগার্জুনে, মহারাজ কণিষ্কের সভা কবি-দার্শনিক-সঙ্গীতজ্ঞ ও মহাযান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থপ্রণেতা অশ্বঘোষ, বিজ্ঞানবাদের সমর্থক অসঙ্গ ও বসুবন্ধু, প্রমাণ শাস্ত্র-কারক ধর্মকীর্তি,

প্রমাণ সমুচ্চয় কারক (হেতু কারক) দিঙনাগ প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত প্রবক্তা পণ্ডিত ভিক্ষুগণেরই সর্বাস্তিবাদী অত্যুজ্জ্বল প্রভাব বিস্তার লাভ করে। আবার এই নবীন বৌদ্ধমত প্রচার করিবার জন্য বাংলাদেশ পাক-ভারত রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ও বাংলাদেশ-পাক-ভারত রাষ্ট্রের বাহিরে বিভিন্ন দেশে প্রচারক ভিক্ষু সংঘ প্রেরিত হইল। এইভাবে বাংলাদেশ-পাক-ভারত রাষ্ট্রের ভিতরে ও বাংলাদেশ পাক-ভারত রাষ্ট্রের বাহিরে মধ্য এশিয়া, চীন, তিব্বত, জাপান প্রভৃতি দেশে পুনরায় এই নবীন বৌদ্ধমত 'সবাস্তিবাদ' প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এইরূপে বাংলাদেশ-পাক ভারতরাষ্ট্র হইতে দুইটি বৌদ্ধমত ধারা বংলাদেশ-পাক-ভারতরাষ্ট্রে ও বহির বাংলাদেশ পাক-ভারত রাষ্ট্রে প্রচারিত হইয়াছে। রাজগৃহের-নিকটবর্তী নাগন্দায় সম্রাট অশোকের বিহার গুপ্তবংশীয় ও পালবংশীয়-রাজন্য বর্গের পৃষ্ঠ পোষকতায় এই নালন্দা বৌদ্ধবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন নাগার্জুন, নাগার্জুনের পরবর্তী অধ্যক্ষ হইলেন ধর্মপাল।

সপ্তম শতাব্দীতে বৈদিক জ্ঞানকান্ডের প্রবর্তক শঙ্করাচার্য শুধু শাস্ত্রার্থেই বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করেন নাই, অধিকন্তু তাঁহার প্ররোচনায় উড়িষ্যার রাজা সুধন্ব অবৌদ্ধ প্রজাদিগকে আদেশ করিলেন যে "হেতু-বন্ধ রামেশ্বর হইতে হিমাদ্রির মধ্যবতী বিশাল সাম্রাজ্যে আবাল বৃদ্ধ বণিতা যত বৌদ্ধ আছে, তাহাদের সকলকে হত্যা কর। যে হত্যা করিবে না তাহাকে হত্যা করা হইবে।" এই আদেশে হাজার হাজার বৌদ্ধকে সমুদ্রে ডুবাইয়া মারিয়াছিল এবং তলোয়ার দ্বারা তাঁহাদের শিরচ্ছেদ করিয়াছিল। এর সত্যতা আনন্দ গিরি ও মাধবাচার্যের 'শঙ্কর দিগ্‌বিজয়' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙ' এর ভারত ভ্রমন কাহিনী এবং 'আর্যমঞ্জু শ্রীমূল কল্প নামক বৌদ্ধগ্রন্থেরও গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিভীষিকাময় উৎপীড়ন কাহিনীর উল্লেখ আছে। আবার কহলন প্রণীত রাজতরঙ্গিনী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসেও

গুপ্তযুগের শেষের দিকে দুর্ধর্ষ হুন জাতির নামক তোরমানের পুত্র রাজা মিহির গুপ্তেরও বৌদ্ধদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের সমর্থন পাওয়া যায়। আরও দিব্যাবদান বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠে জানা যায়, শুংগ বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা পুষ্যমিত্র বৌদ্ধধর্মের প্রতি ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। এরূপে বিভিন্ন গ্রন্থপাঠে বৌদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের উপর তাঁদের অমানুষিক নির্যাতন, বৌদ্ধস্তুপ ও বৌদ্ধবিহার প্রভৃতি ধ্বংসলীলার আভাস পাওয়া যায়।

এতাদৃশ বিভীষিকাময় নিষ্ঠুর অমানুষিক নির্যাতন এবং ধ্বংসলীলা প্রভৃতি কার্যকলাপের ফলে ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় এস, বিল, মহোদয় বলেন,-"যখন পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের আগ্রহ ও কর্মশক্তি অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে বাঙালীর সমুজ্জ্বল প্রতিভা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সেই সময়ে বঙ্গ দেশীয় বিশ্বজয়ী পণ্ডিত ভিক্ষুগণই বৌদ্ধজগতে আধ্যাত্মিক গুরুর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।" তাঁহাদের প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শনের জন্য পূর্বভারত, তিব্বত, সিংহল ও সুবর্ণ ভূমির (জাভা ও সুমাত্রা অঞ্চলের) রাজন্যবর্গ-পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। সেই সময়ে সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে বিশ্ব বিখ্যাত বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত ভিক্ষুশীলভদ্র সপ্ত শতাব্দীতে এই নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান আচার্য ও সর্বাধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন কুমিল্লার অধিবাসী এবং ব্রাহ্মণ রাজবংশের জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়েই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম চতুর্দিকে প্রচারিত হয়। ত্রিপিটক শাস্ত্র, বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। শীলভদ্র এই সকল বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিজে মহাযান মতাবলম্বী হইলেও বৌদ্ধধর্মের অন্যান্য শাখার শাস্ত্রেও সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহার রচিত মূলগ্রন্থগুলি এখন

পাওয়া যায়না। তিব্বতীয় ত্রিপিটকে তাঁহার মাত্র একখানি গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুদিত দেখিতে পাওয়া যায়,-সেই গ্রন্থের নাম "আর্য-বুদ্ধি-ভুমি-ব্যাখ্যান।" সেই সময়ে পালবংশীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহাবিহারগুলি ছিল আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র। সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাস্থবির শীলভদ্রের নিকট ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করেন। তিনি পাঁচ বৎসর বিভিন্ন শাস্ত্রে অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ভারত ভ্রমন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ৬৩০ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাল ভারতে অবস্থান করেন। তাঁহার লেখনী শক্তি ও পাণ্ডিত্যপ্রভা ছিল অসাধারণ। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে তখন কার দিনের ভারতের বহু মূল্যবান তথ্য অবগত হওয়া যায়। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বৌদ্ধশাস্ত্রাদির নকল করেন এবং চীনদেশে ফিরিয়া গিয়া বহুমূল্যবান ভারতীয় শাস্ত্রাদি চীনভাষায় অনুবাদ করেন।

দেববাদ বা তন্ত্রযান

আবার পালবংশীয় রাজার রাজত্বকালে অষ্টম শতাব্দীতে মহাযানী বৌদ্ধধর্মে বলিষ্ঠ তান্ত্রিকমত অনুপ্রবেশ করে। সেই সময়ে ক্রমে ক্রমে বহু দেবদেবীর প্রাধান্য মানব-হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে লাভ করে। এই তান্ত্রিক মতকে বলা হয় তন্ত্রযান। ভারতীয় সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক অধ্যাপক উইনটারনিজ এই তন্ত্রযান সম্বন্ধে বলেন, "তন্ত্রের আদি জন্মভূমি বঙ্গদেশ। বঙ্গদেশ হইতে তন্ত্রশাস্ত্র আসাম, নেপাল, তিব্বত ও চীন পর্যন্ত প্রচারিত হয়।" কিন্তু তন্ত্রযানীদের ধর্মসঙ্গীতি সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তন্ত্রযানই দেববাদ। দেববাদীদের ধর্মগ্রন্থও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৮৩ খানা তান্ত্রিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন।

তিনি ঊনিশ বৎসর বয়সে ও দন্তপুরী বিহারে মহাসাঙ্ঘিক আচার্য শীল রক্ষিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রব্রজ্যাধর্ম গ্রহণের পর গুরু তাঁহার নাম রাখেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি অল্পকালের মধ্যে হীন যান ও মাহযান মতের ত্রিপিটক, মাধ্যমিক ও যোগাচার দর্শন এবং তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ ইতালীয় অধ্যাপক টুচী এবং ভারতীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করিয়াছেন। এযাবৎ ২৮০টি গ্রন্থের নাম পাওয়া গিয়াছে। এই তন্ত্রযানের স্থিতিকাল অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। বৌদ্ধপাল বংশের রাজত্বকালে অবিভক্ত বাংলাদেশে, বিহারে ও উড়িষ্যায় বৌদ্ধতন্ত্রযানের প্রভাব অত্যাধিক ছিল। তাহা চিন-পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এর ভারত ভ্রমন বৃত্তান্তেও অবিভক্ত বাংলাদেশে বৌদ্ধতন্ত্রযানেয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার আভাষ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত বৌদ্ধবিদেষী বাংলা তথা পূর্বভারতের বিখ্যাত সম্রাট শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের পালবংশীয় সম্রাট গোপাল দেব ৭৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবম্বী। তিনি পালবংশ সাম্রাজ্যের ও বিখ্যাত ওদন্তপুর বৌদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ধর্মপাল ৭৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন পালবংশের সর্বাপেক্ষা সুখ্যাতি সম্পন্ন একটি বিরাট শক্তিশালী বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট। তিনি মগধের বিক্রমশীল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরের সুবিখ্যাত সোমপুর বিহার এবং কুমিল্লার ময়নামতী বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মপাল প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মশিক্ষার জন্য তিনি আরও বিভিন্ন স্থানে ৫০ খানা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি হিন্দুধর্মের প্রতিও উদার ছিলেন। পাল বংশীয় পরবর্তী রাজন্যবর্গও ছিলেন প্রত্যেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধধর্মের

হিতাকাঙ্ক্ষী। বাংলায় পাল যুগ সম্পর্কে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার উক্তি আমাদের পক্ষে বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

"সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই নতুন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হয়। ধর্ম, শিল্প, শিক্ষা ও সাহিত্যের অভ্যুদয়েই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন প্রধানতঃ আত্মবিকাশ লাভ করিয়াছিল। পালরাজগণের চারিশত বৎসর ব্যাপী রাজত্ব কাল বাঙ্গালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। ধর্মপালের রাজ্য বাঙালীর জীবন প্রভাত।"

বিক্রমশীল বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার তিন মাইল ব্যবধানে এবং রাজগৃহের ছয় মাইল উত্তরে শীলানামক গ্রামে অবস্থিত। বাংলাদেশের রাজা প্রথম মহীপালের অনুরোধে ১০৬৮ খৃষ্টাব্দে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, মহারাজ ধর্ম পালের প্রতিষ্ঠিত বিক্রয়শীল বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যক্ষ ছিলেন। এক সময়ে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েরও অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন।

তিনি নবম শতাব্দীর শেষভাগে ৯৮২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে এক সামন্ত রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণ শ্রী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। তাঁহার মাতা-পিতা তাঁহার নাম রাখেন চন্দ্রগর্ভ। বজ্রযোগিনী গ্রামে আজও তাঁহার বসতভিটার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণ বৌদ্ধপণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে নাস্তিক পণ্ডিতরূপে অভিহিত করিয়া তাঁহার বাসস্থানকে নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা নাম দিয়াছে। বাল্যকাল হইতে তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী ও জ্ঞানপিপাসু। দশ বৎসর বয়সেই তিনি সংস্কৃত ভাষা, চিকিৎসা ও কারিগরী বিদ্যায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। আরও তিনি জ্ঞান আহরণের জন্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং চট্টগ্রামের জনৈক

ব্রহ্মণপুত্র তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ভিক্ষু চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহারের অধ্যক্ষ প্রজ্ঞাভদ্রের নিকট গমন করেন। সেই সময়ে সুবর্ণ দ্বীপের (জাভা ও সুমাত্রা অঞ্চলের) প্রধান ধর্মাচার্য চন্দ্রকীর্ত্তি বৌদ্ধ জগতে পাণ্ডিত্য ও সাধনালব্ধ দিব্যজ্ঞানে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট শেষ শিক্ষা লাভ করার মানসে তিনি সুবর্ণদ্বীপে গমন করেন। তথায় দ্বাদশ বৎসর অবস্থান করিয়া আচার্য চন্দ্রকীর্তির নিকট শাস্ত্রজ্ঞান ও অধ্যাত্ম সাধনায় গভীর পারদর্শিতা লাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বিক্রমশীল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান আচার্যপদে অবস্থানকালীন তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য প্রভা চতুর্দিকে প্রচারিত হয়। দশম শতাব্দীর শেষভাগে তিব্বতরাজ শেষভাগে তিব্বতরাজ যেশেও বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীর গৌরবরবি বিশ্ববরেণ্য বৌদ্ধপণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে নিজ রাজ্যে প্রচেষ্টাকালে বিধর্মীর হাতে বন্দী হইয়া কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। তৎপর তাঁহার পুন রাজা চংছুপও'র আহ্বানে বৃদ্ধ বয়সে তিব্বতীয় দোভাষীসহ রাজদূতগণের সঙ্গে দুর্গম হিমালয়পর্বত অতিক্রম করিয়া তিব্বতে গমন করেন। তিব্বতে গমনকালে তিনি বুদ্ধগয়া ও অন্যান্য তীর্থস্থান দর্শন করেন। তিনি ছিলেন বহুবিধ অলৌকিক শক্তির অধিকারী। তৎপ্রভাবে তিনি পথিমধ্যে নানাবিধ সংকটময় বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে ও তিব্বতীয় সঙ্গীদিগকে বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তৎপর তিব্বতে উপনীত হইলে তিব্বতীয়দের পবিত্র মন্ত্র "ওম্ মণিপদ্মে হুম্" সমস্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি সেখানে বিপুল রাজকীয় সম্বর্ধনা প্রাপ্ত হন। তিনি বৌদ্ধধর্মে জ্ঞান সম্পন্ন সুপণ্ডিত ছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্র, চিকিৎসা ও কারিগরী বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি তিব্বতীয় ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এই জন্য তিব্বতের অধিবাসীবৃন্দ তাঁহাকে সম্মান সূচক 'অতীশ' (মহামানব বা শ্রেষ্ঠ মানব) উপাধিতে ভূষিত করেন। সেখানে

অবস্থানকালে তিব্বতের এক নদীতে প্রবল বন্যা হয়। তিনি সেখানকার অধিবাসীবৃন্দের দুঃখ-কষ্ট স্বচক্ষে দর্শন করিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্বক নদীতে এক বাঁধ দিয়াছিলেন। বাঁধটির স্মৃতিচিহ্ন আজিও বিদ্যামান আছে। তিনি ছিলেন চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে সংস্কৃতি ও মৈত্রী বাণীর প্রচারক। তিনি সতর বৎসর সেখানে অবস্থানের পর ৭৩ বৎসর বয়সে তিব্বতের রাজধানী লাসার নিকটবর্তী তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত ন্যাথাং বৌদ্ধ মন্দিরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীপঙ্কর তিব্বতে লামা ধর্মের প্রবর্তক হইলেও লামা (ধর্মগুরু) উপাধি গ্রহণ করেন নাই। 'ডোম-তোন-পা' ছিলেন তাঁহার নিত্য সহচর ও অনুগত সেবক তাঁহার সর্বপ্রধান শিষ্য। তিব্বতের লামারা যে পীতবর্ণের ত্রিকোনাকার টুপী ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা অতীশ দীপঙ্কর কর্তৃকই তিব্বতে প্রবর্তিত হইয়াছে। তিব্বতে অতীশ দীপঙ্করের যে মুর্তি অঙ্কিত আছে, তাঁহার মস্তক যে রক্তবর্ণ উষ্ণীধে পরিশোভিত তাহা ত্রিকোনা কার। দীপঙ্করের মৃত্যুর পর তাঁহার সর্ব প্রধান শিষ্য 'ডোম-তোন-পা' সর্ব প্রথম লামা উপাধি গ্রহণ করেন। সেই প্রথা অদ্যাবধি তিব্বতে প্রচলিত রহিয়াছে। তিব্বত বাসীরা আজিও ভগবান বুদ্ধের মূর্তির সঙ্গে তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে স্মৃতিপূজা করে। 'ডোম-তোন-পা' অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবনী গ্রন্থরচনা করেন। সেই গ্রন্থের নাম 'গুরু-গুণ-ধর্মাকর'। ভারতের পরলোকগত বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত রাহুল সাংস্কৃত্যায়ণ মহোদয় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সমাধি মন্দির এবং মন্দিরের অভ্যন্তরে দীপঙ্করের ভিক্ষাপাত্র, কমণ্ডলু ও খদির কাষ্ঠ নির্মিত যষ্টি রাজমুদ্রা অঙ্কিত পিঞ্জরে সুরক্ষিত অবস্থায় দর্শন করেন। বাংলাভাষাবিদ ও সাহিত্যিক রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন ডি, লিট, মহোদয় অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের দিব্যকৃতি ও অবদান সম্পর্কে যাহা বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে স্মরণীয় ও প্রণিধান যোগ্য ঃ-

"এই একজন বাঙালী ভিক্ষু ছিলেন যিনি তৎকালীন জগতে অদ্বিতীয় যশ অর্জনে করিয়াছিলেন। নেপালের রাজা ও রানী তাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। নেপালের যুবরাজ প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে বাস করিতেন। এক কথায় তাঁহার জীবমানকালে দীপঙ্কর সমস্ত এশিয়ার সম্রাটগণের অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কথিত আছে, চীনদেশের অমিত বিক্রম সম্রাটগণ দীপঙ্করের নাম শুনিলেই সিংহাসন হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতেন।"

বাঙ্গালী জাতির চির গৌরব রবি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের চরিত্র মহাত্ম্য ও মহাজ্ঞান দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালীর ইতিহাস প্রণেতা ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় বলেন,-

"চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে, মনীষায় ও অধ্যাত্ম গরিমায় দীপঙ্কর সমসাময়িক বাংলা ও ভারত বর্ষের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। পূর্বভারত ও তিব্বতের মধ্যে যাঁহারা মিলনসেতু রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁদের মধ্যে দীপঙ্করের নাম সর্বাগ্রেও সকলের পুরোভাগে স্মরণীয়।"

বর্তমানে বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে নানাবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ আবিস্কৃত হওয়াতে বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা স্বর্গীয় অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভুষণ, পরলোকগত প্রত্নতাত্ত্বিক ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং অবিভক্ত বাংলাদেশের ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গীয় শরৎচন্দ্রদাশ প্রত্যেকেই বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামই যে দীপঙ্করের জন্মস্থান, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ছিলেন বিদ্যুৎপুঞ্জসম জ্ঞানে প্রদীপ্ত মানব ও উজ্জ্বল ভাস্কর। তাঁহার আবির্ভাবে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীজাতি ধন্য হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অবদানে বিশ্বসংস্কৃতির ভাণ্ডার অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। সেই

তাঁহার ন্যায় ভাষাবিদ্, দার্শনিক, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন আত্মজয়ী পুরুষ ছিল অতিবিরল। তাই দীপঙ্করের ধর্মবিজয়ের জন্য বাঙ্গালীজাতি আজও গর্ববোধ করে।

বাংলাদেশীয় এই দুর্জয় পুরুষমণ্ডিত ইতিহাস প্রখ্যাত মনীষী পণ্ডিত ভিক্ষু অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের দেহভস্মের কিছু অংশ সর্বজন পরিচিত মহামান্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাবলে সদাশয় বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠ পোষকতায় বাংলাদেশ বৌদ্ধকৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি মহামান্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে চীন সাম্রাজ্য হইতে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জুন শুক্রবার বিপুল সমারোহে ঢাকা শহরে কমলাপুর ধর্মরাজিক বৌদ্ধবিহারে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। এই প্রখ্যাত পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করের স্মৃতির সম্মানার্থে ঢাকা কমলাপুর বিহারের নব নির্মিত হলকে 'অতীশ হল' নামকরণ করা হইয়াছে। তাঁহার পবিত্র দেহ ভস্মের সাথে অতীশ দীপঙ্করের প্রতিমূর্তি, তাঁহার স্বহস্তে লিখিত পুঁথি ও অঙ্কিত ছবি বাংলাদেশে আনা হইয়াছে। তৎপর ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত অতীশদীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের আন্তর্জাতিক সহস্রতম জন্মজয়ন্তী বাংলাদেশে প্রতিপালিত হইয়াছে এবং কমলাপুর বিহার সংলগ্ন সন্নিকটবর্তী পশ্চিম পার্শ্বের রাস্তাটি সদাশয় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'অতীশ সড়ক' নাম করণ করা হইয়াছে। বাঙ্গালীর গৌরবরবি অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি ঃ-

"বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি
তুষারে ভয়ংকর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে
বাঙ্গালী দীপংকর।"

তৎপর আর একজন বাঙ্গালী রামচন্দ্র কবিভারতী ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলার গৌড়দেশের অন্তর্গত বীরবতী গ্রামে উচ্চব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবনের প্রথমভাবে শ্রুতি, স্মৃতি, কাব্য, নাটক, তর্কশাস্ত্র ব্যাকরণ, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য বিদ্যালয় পারদর্শিতা লাভ করেন। বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রবল আগ্রহে রামচন্দ্র কবিভারতী রাজা দ্বিতীয় পরাক্রম বাহুর রাজত্বকালে সিংহলে যাত্রা করেন। তিনি সেখানে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধপণ্ডিত ত্রিপিটকাচার্য রাহুলপাদের শিষ্যত্বগ্রহণ করেন। বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নকালে সংঘরাজ বাহুলপাদের ধর্মীয় জীবনের প্রভাবে রামচন্দ্র কবিভারতী পরিশেষে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া প্রব্রজ্যাধর্ম গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র কবিভারতী সিংহলে অবস্থান কালে 'বুদ্ধশতকম্ প্রকাশ ভক্তি শতকম" প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সিংহলের রাজা দ্বিতীয় পরাক্রম বাহু 'বুদ্ধ শতকম্' পাঠ করিয়া অত্যধিক সন্তুষ্ট হন এবং পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিভারতীকে 'বৌদ্ধগমন চক্রবর্তী', উপাধিতে বিভুষিত করিয়া প্রধান ধর্মোপদেষ্টার পদ প্রদান করেন। এইরূপে সিংহলেও বাঙ্গালীর প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। যথার্থ বুদ্ধপূজা কিভাবে করিতে হয়, ঐ বিষয়ে রামচন্দ্র কবিভারতী 'বুদ্ধশতকম্' গ্রন্থের নিম্নোক্ত একটি শ্লোকে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী ও প্রনিধান যোগ্য ঃ-

"মাতেবাসীৎ পরস্ত্রী ভবতি পরধনে ন স্পৃহা পুংসো, মিথ্যাবাদী ন যঃস্যান্ন পিবতি মদিরাং প্রাণি-নো যোগ হন্যাৎ। মর্যাদাভঙ্গ ভীরু ঃ সকরণ হৃদয়স্ত্যক্ত সর্বাভিমানো, ধর্মত্মা তে স এষ প্রতবতি ভগবন্ পাদপূজাং বিধাতুম।"

পরস্ত্রী যার কাছে মায়েরমত, যে-পুরুষের পরধনে স্পৃহা নাই, যে মিথ্যাবাদী নহে, যে মদ্যপান বা প্রাণীহত্যা করেনা, সে মানীর মান ভঙ্গ করিতে ভীত হয়, যাহার হৃদয় করুণাপূর্ণ, যে সকল অভিমান

ত্যাগ করিয়াছে, হে ভগবান্! সে-মহাত্মাই তোমার পদপূজার অধিকার পায়।

আর একজন সপ্তম শতাব্দীর কৃতী-সন্তান-মনীষী বাঙ্গালী ভিক্ষু চন্দ্রগোমীর নাম চীন পরিব্রাজক ইৎ-সিং' এর ভারত ভ্রমন বিবরণীতে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্রের অীধবাসী। তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারে খ্যাতনামা গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রবা ছিল অসীম। তিনি ছিলেন তর্কশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত। তিনি একজন বৈয়াকরণ, কবি, নাট্যকার, নৈয়ায়িক এবং বৌদ্ধতন্ত্রশাস্ত্রের উপদেষ্টা ও লেখক। তাঁহার গ্রন্থ রচনায়ও বৌদ্ধ সাহিত্যের বিপুল পরিপুষ্টি সাধিত হয়।

চট্টগ্রাম

৯৫৩ খৃষ্টাব্দে আরকানরাজ ষোলসিংহ চন্দ্র নিজ রাজ্যের উপকণ্ঠে 'থুরথুন' কে পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করেন। কথিত আছে, দিগ্‌বিজয়ের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ তিনি একটি প্রস্তর বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। এই বিজয় স্তম্বে -'চিং-ত-গৌং' লিপিবদ্ধ ছিল। আরকানের জাতীয় ইতিহাস অনুসারে 'চিৎ-ত-গৌং শব্দের অর্থ 'যুদ্ধলব্ধ স্থান'। এই 'চিৎ-ত-গৌং' হইতে চট্টগ্রাম নামের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত। বকতিয়ার খিলজি কর্তৃক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের পূর্ব হইতে নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বৌদ্ধধর্ম চর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থান ছিল। ইহার উন্নতি কয়েক শত বৎসর অক্ষুন্ন ছিল। এই সময়ে চট্টগ্রামে স্থানে স্থানে অসংখ্য চৈত্যগ্রাম নির্মিত হইয়াছিল। ইহা চীন পরিব্রাজক 'হিউয়েন সাঙ' এর ভারত ভ্রমন বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়। চৈত্য শব্দের অর্থ বৌদ্ধ বিহার এবং গ্রাম শব্দের সমূহ অর্থ সমূহ। অর্থ সমূহ। আবার কোন কোন পণ্ডিতের

অভিমত এই চৈত্যগ্রাম হইতে চট্টগ্রাম শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু যাহাই হউক, চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক মনোরমদায়ক দৃশ্যও কারুকার্য খচিত সুশোভিত অসংখ্য চৈত্যগ্রাম দর্শনে প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আর্কষণ করিত। এই সময়ে মহাযান সম্প্রদায় কর্তৃক বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে চট্টগ্রামকে 'রম্য ভূমি ও পণ্ডিত বিহার' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পণ্ডিত বিহারই তৎকালীন পারবংশীয় রাজন্যবর্গের রাজত্বাকালে পূর্ববঙ্গে প্রধানতম বিহার। তৎকালে পণ্ডিত বিহারের নামানুসারে চট্টগ্রামের সমগ্রস্থানকে নির্দেশ করা হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই 'পণ্ডিত বিহার। চট্টগ্রামের কোনস্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদগণের খনন কার্য ব্যতীত বর্তমানে সঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে কোন কোন পণ্ডিত বলেন এই পণ্ডিত বিহার ছিল কর্ণফুলী নদীর তীরে আনোয়ারা অন্তর্গত বটতলায় নিকটবর্তী ঝিয়রী গ্রামে অর্থাৎ আনোয়ারা থানার দেয়াঙের পাহাড়ে। কিন্তু ঐতিহাসিকের ধারণা, আন্দরকিল্লার রংমহল পাহাড় ও জুম্মা মসজিদের সংলগ্ন অঞ্চলেই এই পণ্ডিত বিহার ছিল। ইংরেজ রাজত্বকালে আন্দরকিল্লার জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণের সময় সেখানে মাটির অভ্যন্তর হইতে একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। সেই বুদ্ধমূর্তি অদ্যাপি চট্টগ্রাম নন্দন কানন বৌদ্ধবিহারে সংরক্ষিত আছে। চট্টগ্রামের ইতিহাস লেখক পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী বলেন, 'প্রথম খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মগধদেশ হইতে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণ পূর্বদেশে (পূর্ববঙ্গে) আসিয়া ধর্মপ্রচার করেন'। সুতরাং বৌদ্ধধর্মই সুতরাং বৌদ্ধধর্মই চট্টগ্রামের প্রাচীনতম ধর্ম। বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতগণ এই পণ্ডিত বিহারে আসিয়া ধর্মচর্চায় নিয়োজিত থাকিতেন। তন্মধ্যে নাড়পাদ, লুইপাদ, অঙ্গবজ্র তঘন, সবরিপদ, অবধুদপদ, নানাবোধ, জ্ঞানবজ্র, বুদ্ধজ্ঞানপদ, অমোঘনাথ, ধর্ম-শ্রীচৈত্র প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভিক্ষু প্রজ্ঞাভদ্র ছিলেন পণ্ডিত বিহারের প্রধান অধ্যক্ষ। এই প্রজ্ঞাভদ্র ছিলেন্ চট্টগ্রামের জনৈক ব্রাহ্মাণের পুত্র। অসংখ্য দেবদেবীর কল্পনা, তাহাদের পূজা, স্তব স্তোত্র, মন্ত্র, টীকাটিপ্পনী সমেত পুস্তক রচনা করা তান্ত্রিক বৌদ্ধ পণ্ডিত ভিক্ষুদের প্রধান কাজ ছিল। প্রজ্ঞাভদ্র নিজেও সংস্কৃত ভাষায় শ্রী সহজ শম্বরাধিষ্ঠান, অচিন্ত মহামুদ্রান াম, চতুচর্তুরোপদেশ, প্রসন্নদীপ, মহামুদ্রোপদেশ, দোঁহাকোষ, ষড়ধর্মোদেশ প্রভৃতি বহু তান্ত্রিক গ্রন্থরচনা করেন। বহু পণ্ডিত ভিক্ষু এই পণ্ডিত বিহার হইতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে নেপাল ও তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। নাড়পাদ ছিলেন প্রজ্ঞাভদ্রের প্রধান শিষ্য তিনি ষড়ধর্মোপদেশ পালি ভাষায় অনুবাদ করেন। বাংলার বরেণ্য সন্তান বিশ্বনন্দিত বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানও বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান লাভের প্রত্যাশায় প্রজ্ঞাভদ্রের নিকট এই পণ্ডিত বিহারে আগমন করেন। তৎকালে পণ্ডিত বিহার ছিল আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য বৌদ্ধধর্মচর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থান।

এই পুরাতন পণ্ডিত বিহারের পূর্ব লুপ্ত গৌরবস্মৃতি স্মরণার্থে চট্টগ্রাম শহরের চকবাজার অলিখাঁ মসজিদের উত্তর পার্শ্বে কাতালগঞ্জে একখানা সুশোভিত এলাকায় ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার বৌদ্ধজাতির বৃহত্তর প্রাণবন্ত পরিকল্পনা গ্রহণে সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'নব পণ্ডিত বিহার' এর শুভ উদ্বোধন করা হয় এই উপলক্ষে চট্টগ্রামের বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রামের নেতৃস্থানীয় বৌদ্ধ জনসাধারণের সমাগমে এক মহতী সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি মহামান্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির মহোদয়। এই 'নব পণ্ডিত বিহার' যাহাতে পূর্বের ন্যায় আদর্শস্থানীয় হয়, তজ্জন্য সভাপতি মহোদয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রস্থানে জনসাধারণের যাতায়াতের

সুবিধার্থে প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল বৌদ্ধ পণ্ডিত বিহারের ধ্বংসপ্রাপ্ত লুপ্ত স্মৃতি পুনরুদ্ধারের জন্য মহামান্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির মহোদয়ই এই নব পণ্ডিত বিহারের সর্বপ্রথম বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির মহোদয়ই এই নব পণ্ডিত বিহারের সর্বপ্রথম উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার অন্যতম প্রিয়মত শিষ্য পণ্ডিত প্রবর সুবক্তা শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ মহাস্থবির, দর্শন সাগর মহোদয়ের উপর অত্রবিহার সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য দায়িত্বভার অর্পণ করা হয় তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে ও বলিষ্ঠ কর্মতৎপরতায় অত্র বিহার দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

আবার পরিশেষে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এখানকার প্রাচীন বৌদ্ধযুগের বহুস্মৃতিচিহ্ন পাওয়া যাইতেছে। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অত্র জেলায় রাউজান থানার অন্তর্গত উল খালের মুখে কর্ণফুলী নদীতে এক হাজার বৎসর পূর্বের বৌদ্ধরাজত্বকালের বিশেষ আর্কষণীয় কারুকার্য খচিত উজ্জ্বল সুশোভিত একখানি নামি বৃহৎ কৃষ্ণ কষ্টি পাথরে ক্ষোদিত গৌতম বোধিসত্বের জন্ম হইতে গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভ পর্যন্ত উক্ত প্রস্তাবের চতুর্দিকে বিভিন্ন দৃশাবলীর ১২৮টি ছোট ছোট মুর্তি সহ মধ্যস্থানে ধ্যানরত বড় আকারের প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহা বর্তমানে রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত বেতাগী গ্রামে রত্নাংকুর বিহারে বাংলাদেশ বৌদ্ধকৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি মহামান্য বিশুদ্ধান্দ মহাথের কর্তৃক ১৯৮০ খৃষ্টাব্দের (২৫২৪ বুদ্ধাব্দের) ১৩ই সেপ্টেম্বর শনিবার বিপুল জন সমারোহে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। ধ্যানরত বুদ্ধমূর্তির নিম্নভাগে ইহার লিপিবদ্ধ বিবরণী পরিদৃষ্ট হয়। এযাবৎ লিপি বদ্ধ বিবরণীয় পাঠোদ্ধার কেহই করিতে পারে নাই। ইহার প্রাচীন লিপিবদ্ধ বিবরণীর পাঠোদ্ধারের জন্য অভিজ্ঞ তত্ত্বান্বেষী মনীষীর প্রয়োজন। বর্তমানে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীবৃন্দ জাতিধর্ম নির্বিশেষে অত্রস্থানে দর্শন প্রার্থী যাত্রীদের সময় সময় জনসমাগম হইয়া থাকে।

মগ বড়ুয়া গোষ্ঠীর পরিচিতি

নবম শতাব্দীর শেষভাগে আরাকানরাজ 'ন্যা-সিং-ন্যা-নৈ' ৯৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে চাক্‌মাগণের সাহায্যে চট্টগ্রাম অধিকার করিলেন। ইহার পর হইতে আরকান রাজবংশকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু চট্টগ্রামে আরাকান রাজার রাজত্বকাল হইতে এতৎ অঞ্চলে আরকানীদের বসবাসের ভিত্তি স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইল। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে শানরাজ্যের ও দিকে 'পোয়াং' রাজ্য অবস্থিত ছিল। এই 'পোয়াং' রাজ্যের অধিবাসীরাই ছিল আরকানীদের মিত্রজাতি। তাহাদের মধ্যে অনেকেই আরকানী রাজসরকারের অধীনে কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করিতে থাকে। আর একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রহ্মদেশের একটি রাজ্যে পঁগা বা অরিমর্দনপুর আরকানের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তৎকালে ব্রহ্মদেশে মোগং বৃহত্তম রাজ্য ছিল। কিন্তু রাজ্য অনরটার অধীনে পঁগা বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। রাজা অনরটা আরকান দখল করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করেন। আরকানের অধিবাসীবৃন্দ তথা মোগংরাজ্যের অধিবাসী বৃন্দ এই 'মাগং' শব্দ হইতে 'মোগ' অপভ্রংশে 'মগ' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অপরটা ছিলেন আরিধর্মাবলম্বী। অপরটার প্রধান ধর্মযাজক শিন অরহণের প্রচেষ্টার ব্রহ্মদেশে আরিধর্ম নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় এবং থেরবাদী বা হীনযানী বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। তাঁহার প্রবল প্রচেষ্টায় সংস্কৃত ভাষাকে উচ্ছেদ করিয়া বৌদ্ধধর্ম পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়। অনরটা মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ক্যনয়িত্তা রাজা হন। ক্যনয়িত্তার রাজত্বকালে একদিকে ভারতে বৌদ্ধগণের প্রতি অত্যাচার, ধ্বংসলীলা চরম পর্যায়ে উঠে, অন্যদিকে শিন অরহণের প্রভাবে পঁগা বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ভারত হইতে প্রাণভয়ে পলায়মান বৌদ্ধগণ অনেকেই পঁগায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সময় কানয়িত্তা বুদ্ধগয়ার মন্দির সংস্কার সাধন করেন।

বিভিন্ন গ্রন্থপাঠে জানা যায়, বৌদ্ধপাল সাম্রাজ্যের পতনের পর দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়। সেনরাজবংশের আক্রমণে শ্রদ্ধাবান বৌদ্ধরাজন্যবর্গ ও শ্রেষ্ঠীগণ কর্তৃক বৌদ্ধমঠ মন্দিরে প্রদত্ত বিপুল ধনরাশি লুন্ঠন এবং ধ্বংসলীলার সূত্রপাত হয়। আবার ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কী বীরেরা সমস্ত উত্তর ভারত নিজেদের হস্তগত করিল। মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খিল্‌জি স্বল্প-সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ওদন্তপুরী, নালন্দা, বিক্রমশীল, বঙ্গদেশ প্রভৃতি জয় করার পর সমস্ত মূর্তি ও অগণিত আদর্শ শিল্পকলা ধ্বংস করা হইল, সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থ ভস্মীভূত করা হইল এবং শত শত তান্ত্রিক ভিক্ষুর শিরচ্ছেদ করা হইল। এতদ্ সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় প্রণীত বাংলার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগে এবং খ্যাতনামা লেখক মীন-হাজ-উস-সিরাজী বিরচিত তবকৎ-ই-নাসীরী নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের ৫৫০ পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ পাওয়া যায়।

এরূপে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে উপর্যুপরি পুনঃ পুনঃ মর্মান্তিক বৌদ্ধ নির্যাতন ও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি সমূলে ধ্বংস করার ফলে সেখানে বৌদ্ধগণের বসবাস নিরাপদ নহে মনে করিয়া অনেকেই ধর্মান্তরিত হইয়া গেল। কিছুসংখ্যক বৌদ্ধ নেপাল ও তিব্বতে চলিয়া গেল। আর মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বৈশালীর বর্জি বংশীয় এক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র বহুসংখ্যক অনুচরবৃন্দসহ মগধ সাম্রাজ্য হইতে প্রাণভয়ে পলায়ণ করিয়া পঁগার পথে আসাম, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালিতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকে। মগধের বর্জিবংশ সম্ভূত 'বর্জি, শব্দ হইতে বড়ুয়া শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই বড়ুয়াজাতি মগধের বর্জি বংশীয় ক্ষত্রিয় জাতি। বর্জি শব্দের অর্থ বড়

বা উৎকৃষ্ট। যাহারা আসামে ছিল, সেই বড়ুয়া উপাধিধারী বহু লোককে সেন রাজবংশের রাজত্বকালে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণে হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণের আসন প্রাপ্ত হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল না। তাহারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিলেও পূর্বপুরুষদের 'বড়ুয়া' পদবী ত্যাগ করে নাই এবং বংশ পরম্পরায় অদ্যাবধি নামের সঙ্গে 'বড়ুয়া' শব্দ ব্যবহার করিতেছে। মগধের বৃজিজাতি সেখানকার অভিজাত রাজবংশের বংশধর। বৃর্জি শব্দের অপভ্রংশে বড়ুয়া শব্দ হওয়া স্বাভাবিক। সাহিত্যসেবী দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৮১৫ শতাব্দে (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে) চৈত্র সংখ্যায় বলেন,–"দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধরা অমানুষিক নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করিয়া মগধ সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এতদ্দেশে আরকান বৌদ্ধরাজার আশ্রয় গ্রহণ করে।" বড়ুয়ারা বহু বৎসর আরকানী মগদের সঙ্গে বসবাস করার ফলে তাহাদের মধ্যে পরস্পর সৌহৃদ্যতা বাড়িয়া উঠিল এবং বিবাহ বন্ধনও ক্রমশঃ আরম্ভ হইল। ইহার ফলে বড়ুয়া সমাজেও মগানাম প্রচলিত হইয়াছিল; যেমন ঃ- মমপ্রু বড়ুয়া, চাইলাপ্রু বড়ুয়া, হোয়াপ্রু বড়ুয়া, মঞ্চাপ্রু বড়ুয়া, ছাদপ্রু বড়ুয়া, চরপ্রু বড়ুয়া, চরপ্রু বড়ুয়া, কেওজপ্রু বড়ুয়া ইত্যাদি। এই সুদীর্ঘ কালের সম্পর্ক হেতু আজিও বহু আরকানী শব্দ বাঙ্গালী বৌদ্ধসমাজে মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। শব্দগুলি প্রায়ই ধর্মীয় সংস্কৃতি মূলক; যেমন ঃ- কেয়াং-বিহার, ফুংগী–ভিক্ষু, ফাং–নিয়ন্ত্রণ, ছোয়াইং-বাত (পিণ্ডদান), ফয়া-বুদ্ধ, তারা–ধর্ম, চাঙ্কা-সংঘ, থাগা–গৃহী উপাসক, কারেঙ্গা–সেবক, রাচি-মহিলা ব্রহ্ম-চারিনী, রাউলী-গৃহীভিক্ষু, থাধূথাং-বুদ্ধের জীবনী, মইসাং-শ্রামণের, ছাউনী-অস্থায়ী শ্রামণের, ছাদাং ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত আরম্ভ ও পরিসমাপ্তির দিন, ফরাদাং-ফুজার বেদী, থাংথুং-স্তুপাকৃতি অন্ন, ঘেইং-ভিক্ষু সীমা, ছাবাইক–ভিক্ষাপাত্র, চাঁই-চীবর, নাং-নমস্কার, একাজিক-উত্তরাসঙ্গ,

দোয়াজিক-সংঘাটি, ওা-এক বর্ষাবাস মাসত্রয়ের সমষ্টি, ওয়াইক–ভিক্ষু পরিবাস, ফারিক–সূত্রপাঠ, ভং-বড় ঘন্টা, লাপফই দোয়াইং–মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে মৃতদেহ সৎকারের পার দ্বিতীয় দিনে ভিক্ষুকে–পিণ্ডদান, লোথক-ভিক্ষু ধর্ম পরিত্যক্ত গৃহী, আতাইং মাইং-শ্রাদ্ধকর্ম বা বিবাহের পূর্বে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ বৈঠক, চাইং মাতাইং–ধর্মে কর্মে বা শীল গ্রহণের সময়ে চাদর বা যে কোন কাপড় বামস্কন্ধ উপরি একাংশ করিয়া ভিক্ষুর উত্তরাসঙ্গ চীবরের ন্যায় ব্যবহার করা, জেদি-গম্বুজ সমন্বিত স্মৃতি মন্দির, মাথেচারা-মহাস্থবির ইত্যাদি।

তদ্ধেতু বড়ুয়া সমাজের গোষ্ঠী বা ত্রেতা নির্ণয় পূর্বগোত্র লুপ্ত হইয়া আরকানীদের অনুকরণে হইয়াছে; যেমনঃ- মূলাইং, ছিদাইং, হাছাগ্রী, আনক্কা ফুন্সী, লেবাইং ইত্যাদি, বর্তমানেও বাংলাদেশ মগীসন প্রচালিত আছে।

আরকানী বৌদ্ধেরা বাঙ্গালী বৌদ্ধদিগকে ব্রহ্মভাষায় 'মার্মাগ্রী' বলিয়া উল্লেখ করিত। 'মার্মাগ্রী' শব্দের অর্থ উচ্চ বংশীয় ক্ষত্রিয় বৌদ্ধ। আবার এই রাজবংশের ক্ষত্রিয়গণ 'মগধ সাম্রাজ্ঞ দেশাগত' বলিয়া তাহাদিগকে সংক্ষেপে 'মগ' নামেও অভিহিত করা হইত। ইহার সমর্থনেও কয়েকটি যুক্তি রহিয়াছে। মগধ সাম্রাজ্য দেশাগত বড়ুয়াগণ অর্থাৎ মগধগণ তাহাদের পৈতৃক দেশমাতার স্মৃতিকল্পেও স্মরণার্থে পাঁঠি বলি দিয়া মগধেশ্বরীর সেবা বা পূজা করিত। অদ্যাবধি প্রায় বৌদ্ধগ্রামে এক একটা সেবা খোলা রহিয়াছে। উপসনাকালে 'আয়রে মা মগধ রাজার ঝি' ইত্যাদি বলিয়া নিঃসন্তানের সন্তান লাভ এবং ভুত প্রেতদিগকে তাড়াইবার জন্য এইরূপ মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে বৌদ্ধ সম্প্রদায় গুলি বিভিন্ন দেশ হইতে এদেশে বসবাস শুরু করিয়াছে। আরকানী বৌদ্ধ ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের সমগ্র জীবনযাত্রা, বেশভুষা, ভাষা, গোষ্ঠির

ইতিহাস, গায়ের রং, চেহারা, নাসিকা, চুল, শারীরিক গঠন, দৈহিক আকৃতি, সামাজিক আচার ব্যবহার প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং ইহা হইতে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, আরকানী বৌদ্ধ ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদিগকে যে মগ বলা হয়, তাহারা একই ধর্মাবলম্বী হইলেও মূলতঃ 'মগ' শব্দটি কোর্থবোধক শব্দ নহে।

আবার বড়ুয়া শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কোন পণ্ডিত বলেন,–ভগবান বুদ্ধ মানব-সমাজের ভাব-দুঃখ-মুক্তির উদ্দেশ্যে নেই সত্যপথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা পালি ভাষায় 'অরিয় সচ্চং' এবং বাংলা ভাষায় 'আর্যসত্য' বলা হয়। যাঁহারা বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম তথা আর্যসত্য গ্রহণ করিতেন, তাঁহারাই বড় আর্য বা বৌদ্ধ (বৌদ্ধ=বুদ্ধ+ষ্ণ, বুদ্ধের উপাসক বা শিষ্য) নামে অভিহিত হইতেন। এই 'বড় আর্য' হইতে 'বড়ুয়া' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ইহার সমর্থনেও যুক্তি রহিয়াছে। চট্টগ্রামে বৌদ্ধ সমাজে পুত্রবধুগণ শ্বশুরকে 'বউড়ুগ্যা' ডাকিত। এই 'বউড়ুগ্যা' শব্দ 'বড়ুয়া' শব্দের অপভ্রংশ। 'বড়ুয়া' শব্দের অর্থ 'বড় আর্য'। আবার পুত্র বধুগণ শাশুরী মাতাকে 'আযোয়্যাঁ' ডাকিত। এই 'আযোয়্যাঁ' শব্দ 'আর্যমা' শব্দের অপভ্রংশ। এখানে 'আর্যমা' শব্দের অর্থ 'বড় আর্যমা'। কিন্তু বড়ুয়া শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করিলেও মূলতঃ শব্দের মর্মার্থ একার্থ বোধক। তদ্ধেতু নিংসন্দেহে বলা যায়, 'বড়ুয়া, শব্দটি বর্জিশব্দ হইতে আগত। মগধ সাম্রাজ্যের বিহারের নামানুসারে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজেও কয়েকটি গোষ্ঠী বা গোত্রের সহিত মিল দেখা যায়; যেমন ঃ- বড়ুয়া বাহু, বড়ুয়া চোমড়া, বড়ুয়া রাউচ্চী ইত্যাদি।

কয়েকটি গোষ্ঠীর তালিকা ঃ-

মুলাইং ঃ- ঙোহে লহান্।

ঙোহে = রূপা। লহান্ = বল্লম, দণ্ড।

রৌপ্য নির্মিত দণ্ড আরকান রাজাকে উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল, এই জন্য মুলাইং গোষ্ঠী বা গোত্র হইয়াছে।

ছিদাইং ঃ- সোয়ে ল্হান্।

সোয়ে = সোণা । ল্হান্ = দণ্ড।

স্বর্ণ নির্মিত দণ্ড আরকান রাজাকে উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল, এই জন্য ছিদাইং গোষ্ঠী হইয়াছে।

হাছাগ্রী ঃ- রোয়াজা + ওয়াগ্রী।

রোয়াজা = মাতব্বর। ওয়াগ্রী = শ্রেষ্ঠ, বড়। হাছাগ্রী = বড় মাতব্বর।

লোবাইং ঃ- লে=জমি। বাইং = অধিকারী। লেবাইং-জমিদার।

যাহাদের অধিক জমি দখলে ছিল, তাহারা লেবাইং গোষ্ঠী।

আনক্কা ফুঙ্গী ঃ- আনাউক + ফুঙ্গী।

আনাউক = পশ্চাৎ, পশ্চিম। ফুঙ্গী = ভিক্ষু।

পশ্চিম দ্বারের বিহারস্থ ভিক্ষু লোথক বা গৃহী হইয়া তাহার যে-বংশধর হইয়াছে, তাহারা সেই গোষ্ঠী।

লোথক -ঃ লু = লোক, টুয়েক = চলিয়া যাওয়া।

যাহারা ভিক্ষু ধর্মাত্যাগ করিয়া গৃহী হইয়াছে, তাহাদিগকে লোথক বলে।

মিমাগ্রী = বড় রাজকন্যার গোষ্ঠী। ধুংসাং = বাজিকর। চোট্টাছাত্তাং = রাজদ্রোহী। রোয়াজা = মাতব্বর। থরভরিথঞ্জা = রাজার গোষ্ঠী। মোঁ, গুণা = সংঘ-রাজের গোষ্ঠী। মংকুং = রাজবংশ।

লুলাম্বা, কামাংসু, কায়ঞ্চ, হোয়াসাং, ক্যজ, কৈলাংগ্রী, রাম্বত,

লাওয়েলা, তেলং, মোচাতেলং, থঞ্জা, আচেকালা, গাচ্ছাল, হরয়্যা, ফুলক, দলু, ফটিক, হ্রেস, ক্ষুদ্যারাউলী, মাং, খাইং ইত্যাদি।

আরকানী ভাষায় ভিক্ষুকে ফুঙ্গী বলা হয়। ফুঙ্গী উপাধিধারী কয়েকটি গোষ্ঠী বৌদ্ধ সমাজেও পরিদৃষ্ট হয়; যেমন ঃ- আরিপা ফুঙ্গী, আনাপ্পা ফুঙ্গী, মোরপ্পা ফুঙ্গী, হানিপা ফুঙ্গী ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য ঃ এতদ্ব্যতীত শত শত গোষ্ঠীর নাম পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর তাৎপর্য উদ্ধার করা অত্যন্ত সুকঠিন কাজ। চাকুরী জীবনের পদবী সমাজ জীবনের প্রাধান্য, ব্যক্তিগত কর্মের আধিপত্য প্রভৃতিতে প্রধান প্রধান ব্যক্তির নামে সাধারণতঃ গোষ্ঠীর পরিচয় পরিদৃষ্ট হয়। আবার তখনকার দিনে কেহ কেহ কিঞ্চিত মাত্রও সমাজে প্রাধান্য লাভ করিতে না পারায় কোন কোন পরিবারের গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায় না।

মুচ্ছদ্দী-তালুকদার-চৌধুরী-শিকদার সিং বা সিংহ-হাজারী

আরকান বাজার রাজত্বকালে পর্তুগীজ বণিকেরা চট্টগ্রাম বাণিজ্য করিত। তাহাদের অনেকেই এখানে বসতি স্থান করে। তাহারা নৌবিদ্যা বিশারদ বলিয়া আরকানরাজ তাহাদিগকে নৌসৈন্য ভর্তি করেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাব সায়েস্তা খান কর্তৃক সর্বশেষ আরকানরাজ পরাজিত হইলে অধিকাংশ আরকানী স্বদেশে চলিয় গেল। যাহারা রহিল, তাহাদের বংশধরগণ চট্টগ্রাম জেলার 'কক্সবাজার, রামু, নীলা, টেকনাফ, হারভাং' প্রভৃতি স্থানে এবং বরিশাল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম' জেলায় বসবাস করিতেছে। এই সময়ে চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, রাষ্ট্রবিপ্লবে বৌদ্ধগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ায় আবার বৌদ্ধধর্মে পরিহানি চরম পর্যায়ে গিয়া পৌছিল। মুসলমান শাসনকালে অনেক বড়ুয়া উচ্চ রাজকর্মচারীর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। যাঁহারা স্টেটের ম্যানেজার ছিলেন, তাঁহাদের উপাধি (পদবী) ছিল মুচ্ছদ্দী। ভুমির রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য ভূমিখণ্ড তালুক ও তরফে বিভক্ত করা হইল। যাঁহাদের তালুক ছিল, তাঁহারা হইলেন তালুকদার এবং যাঁহাদের তরফ ছিল, তাঁহারা হইলেন তরফদার বা জমিদার। এই তরফদারের উপাধি ছিল চৌধুরী বা ভুইঞা! শিকদার:- ইহা সাময়িক বিভাগের উপাধি। ইহার অর্থ সর্দার। উকিয়া থানা, মির্জাপুর ও গাছবাড়িয়া গ্রামে শিকদার উপাধিকারী বড়ুয়া গোষ্ঠী আছে। ক্ষত্রিয় জাতির উপাধি ছিল সিং বা সিংহ। ক্ষত্রিয় শাক্যকুল চুড়ামনি ভগবান তথাগত গৌতম বুদ্ধের কিংবা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের দেশনায় বিমুগ্ধ হইয়া বিপুল

সংখ্যক ক্ষত্রিয় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই ক্ষত্রিয়গণ ধর্মান্তরিত হইলেও তাহাদের পূর্ব বংশগত ঐতিহ্য অনেকেই 'সিং বা সিংহ' উপাধি পরিত্যাগ না করায় অদ্যাপি বৌদ্ধদের মধ্যে সিং বা সিংহ উপাধি বৌদ্ধ পরিদৃষ্ট হয়। সিং পশ্চিম ভারতীয় পাঞ্জাব অথবা রাজপুতনাবাসী ক্ষত্রিয়ের উপাধি। প্রাণভয়ে পলায়ণের সময় পশ্চিম ভারতীয় সিং বা সিংহ উপাধিধারী খাঁটি গোড়া বৌদ্ধেরা খুব সম্ভবতঃ পলাতক মগধক্ষত্রিয়দের দলে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দলভূক্ত হইয়াছিলেন। সিং বা সিংহ উপাধিকারী বড়ুয়া বৌদ্ধ রামু থানা, কুমিল্লা, লাকসাম, নোয়াখালী ও সীতাকুণ্ডে পরিদৃষ্ট হয়। হাজারী:- ইহা সামরিক বিভাগের উপাধি। এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ককে হাজারী উপাধি প্রদত্ত হইত। এই উপাধিকারী বড়ুয়া নোয়াখালীতে পরিদৃষ্ট হয়। সেই সময় হইতে এই সকল উপাধি বংশপরম্পরা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মুসলমান রাজত্বকালে এরূপে সুদীর্ঘকাল তাহাদের সঙ্গে মেলামিশার ফলে বড়ুয়া সমাজেও বর্তমানে সামাজিক আচারে ব্যবহারে এবং বিবাহাদি অনুষ্ঠানে ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে; যেমনঃ-গোছল-স্নান। ঘরছালামী–বৈবাহিক অনুষ্ঠানে গৃহদেবতা, বয়ঃবৃদ্ধ ও বয়ঃ বৃদ্ধাদিগকে নমস্কার করা। পানছল্লা-নিমন্ত্রণ করার পূর্বে সুশৃঙ্খলার সহিত কাজ করার জন্য সামাজিক বৈঠক।

অন্ধকার যুগে সমাজ সংস্কারকবৃন্দ এবং সংঘরাজ নিকায় প্রতিষ্ঠা

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে আকিয়াবের শিল্পী দ্বারা রাউজান থানার পাহাড়তলী গ্রামে, আরকানের পাথরী কেল্লায় ভগ্নাবশেষ রাজ প্রাসাদের চারিক্রোশ (আট মাইল) দূরবর্তী বিরাট মহামুনি বিগ্রহ সদৃশ মহামুনি আখ্যা প্রদানে অবিকল এক বিরাট বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের মান রাজার পূর্ববর্তী ধার্মিক প্রবর রাজা কুঞ্চধামাই এই বুদ্ধমূর্তি এক চূড়াযুক্ত পাকামন্দিরে স্থাপন করেন, এবং মহানন্দ বিহার নির্মাণ করেন। আরও তিনি তীর্থ যাত্রীদের সুবিধার জন্য মহামুনি মন্দিরের পশ্চিমোত্তর পার্শ্বে ধামাই দীঘি নামে একটি বৃহৎ দীঘি খনন করেন। তাঁহার পুত্র কেওজক্র মানরাজা মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া মহামুনি মন্দিরের চতুর্দিকে প্রশস্ত পাকা দেওয়াল ও পঞ্চচূড়াযুক্ত বুদ্ধ মন্দির সুশোভিত আকারে সংস্কার করেন। সেই সময় হইতে প্রত্যেক বৎসর চৈত্র সংক্রান্তি হইতে পক্ষকালব্যাপী স্থায়ী মহামুনি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

সেই সময়ে ধর্মপরায়ণা চাক্‌মারাণী কালিন্দী প্রজাদিগকে ধর্মীয় প্রেরণায় প্রবুদ্ধ করিবার মানসে রাঙ্গুনিয়া থানায় হিন্দুদের জন্য কালিমন্দির, মুসলমানদের জন্য মসজিদ এবং বৌদ্ধদের জন্য বিভিন্নস্থানে বিহার স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে চৈত্র সংক্রান্তিতে পাহাড়তলী মহামুনি মেলায় পাহাড়ী মগ ও চাক্‌মাদের মধ্যে এক বিরাট চাঞ্চল্যকর মর্মান্তিক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। সেই দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে চাক্‌মা জাতি ধর্মীয় ঐতিহ্য বজায় রাখিবার

জন্য চাক্‌মা নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তাই তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজধানী রাঙ্গুনিয়া থানার রাজানগরে তাঁহার দ্বিতল প্রাসাদের সম্মুখস্থ অনতিদূরে চতুর্দিকে সুপ্রসস্থ পাকা দেওয়ালের বেষ্টনীসহ পঞ্চচূড়াযুক্ত পাকা মন্দিরের অভ্যন্তরে আকানের কেয়ক্ত নামক স্থানের বিরাট বুদ্ধমূর্তি সদৃশ শাক্যমুনি আখ্যা প্রদানে ব্রহ্মদেশীয় শিল্পী দ্বারা এক বিরাট বুদ্ধমূর্তি স্থাপন ও কারুকার্য খচিত পাকা বুদ্ধমন্দির নির্মাণ করেন এবং তীর্থ যাত্রীদের সুবিধার্থে পুকুর দীর্ঘি ও বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রত্যেক বৎসর চৈত্র সংক্রান্তি হইতে পক্ষকাল ব্যাপী স্থায়ী শাক্যমুনি মেলা স্থাপন করেন। তৎপর মগ ও চাক্‌মা জাতির মধ্যে বিবাদ মীমাংসা স্থাপনের জন্য মানরাজা ও চাক্‌মারাণী কালিন্দী প্রমুখ উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ সহ এক মিলন বৈঠক আহুত হয়। সেই মিলন বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত ও প্রচারিত হইল যে প্রত্যেক বৎসর চৈত্র মাসের শেষ তারিখে পাহাড়ী মগেরা পাহাড়তলীতে মানরাজা প্রতিষ্ঠিত মহামুনি মেলায় এবং চাক্‌মারা রাজানগরে চাক্‌মারাণী কালিন্দী প্রতিষ্ঠিত শাক্যমুনি মেলায় নির্বিঘ্নে ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করিতে পারিবে। তদ্‌পরদিবস নব বৎসরের প্রথম দিন (বৈশাখ মাসের ১লা তারিখ) পাহাড়ী মগেরা রাজানগরে চাক্‌মারাণী প্রতিষ্ঠিত শাক্যমুনি মেলায় এবং চাক্‌মারা মানরাজা প্রতিষ্ঠিত পাহাড়তলী মহামুনি মেলায় নিবিঘ্নে ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করিতে পারিবে। আর বড়ুয়া বৌদ্ধগণ নব বৎসরের দ্বিতীয় দিবসে (বৈশাখ মাসের ২য় তারিখে) উভয় মেলায় যোগদান করিতে পারিবে। এরূপভাবে সকল শ্রেণীর বৌদ্ধদের ধর্মকর্মে যোগদানের জন্য সন্ধি স্থাপিত হইল। এইরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপী স্থায়ী আর কোন মেলা বাংলাদেশ পাক-ভারতরাষ্ট্রে দৃষ্ট হয় না। মানরাজা প্রতিষ্ঠিত মহামুনি মেলা এবং চাক্‌মারাণী কালিন্দী প্রতিষ্ঠিত শাক্যমুনি মেলা-এই দুইটি বৌদ্ধমেলা তখনকার দিন হইতে

বৌদ্ধ জাতির গৌরবময় অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। এই দুইটি বৌদ্ধ মেলাই ছিল চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বড়ুয়া, চাকমা, মান, বোমাং, মার্মা প্রভৃতি সকল শ্রেণীর বৌদ্ধদের একমাত্র মিলনক্ষেত্র। আজিও রাঙ্গুনিয়া থানার বিভিন্ন স্থানে সম্ভ্রান্ত চাক্‌মাবংশের ও চাক্‌মা রাজবংশের বহু কীর্তি কাহিনী, পরিদৃষ্টি হয়, যেমন ঃ– পুরাতন রাজবাড়ী, রাজার হাট, ধামাইরহাট, রোয়াজাহাট, রাজানগর, দেওয়ান বাজার, রাজবিহার, ধামাইরখিল, রোয়াজাখিল, রাজার দিঘী, রাজবিলি, শুকবিলাস ইত্যাদি।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে আরকানের আচার্য সারালঙ্কার মহাস্থবিরের উপায়ধ্যায়ত্বে বিনয়কর্ম উপযোগী ভিক্ষু সংঘের উপস্থিতিতে শ্রামণের সারমেধের (আবার সারমেধ সারমিত্র নামেও পরিচিত) উপসম্পদা কর্ম সম্পাদিত হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে আচার্য সারালঙ্কার মহাস্থবিরের দেহত্যাগের পর তাঁহার শিষ্য সারমেধ উক্ত বিহারের অধ্যক্ষ হন। সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার, সদ্ধর্ম প্রচার ও বিনয় কর্মানুযায়ী আচরণের ফলে তাঁহার নাম যশঃ প্রতিপত্তি দুরদূরান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বৃটিশ সরকার প্রথিত যশা শাসন হিতৈষী পণ্ডিতাগ্রগণ্য সারমেধ মহাস্থবিরকে 'সারমেধালঙ্কারাভী'তি সাসনধর মহাধর্ম্ম রাজাধিরাজগুরু' এই মহান সম্মানিত উপাধি প্রদান করেন। বৃটিশ সরকার প্রদত্ত উপাধি এবং স্থানীয় ভিক্ষু সংঘের নায়কত্ব লাভে তিনি সংঘরাজ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তদবধি তাঁহার বিহার সংঘরাজ বিহার নামে পরিচিত হইল। সংঘরাজ সারমেধ ছিলেন আরকান রাজ পরিবারের বংশধর। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সর্বপ্রথম কলিকাতা মহানগরীতে চট্টগ্রামের প্রবাসী বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ কর্তৃক কলিকাতার-ওয়ারিশ বাগানে-বৌদ্ধবিহার নির্মিত হয়। এই বিহারে উপযুক্ত ভিক্ষুর প্রয়োজন হইলে চট্টগ্রাম জেলায় পটিয়া থানার উনাইনপুরা গ্রামের তদানীন্তন ভিক্ষুনেতা সুধন

মহাস্থবির মহোদয় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চন্দ্রমোহন ভিক্ষুকে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। তিনি এই বিহারে অবস্থান করিয়া বিদ্যানুশীলন প্রেরণ করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মে সুপণ্ডিত ছিলেন। ভিক্ষু চন্দ্রমোহন তাঁহার নিকট হইতে ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ অধ্যয়নকালে জানিতে পারিলেন যে চট্টগ্রামের ভিক্ষুগণ বিনয়সম্মত উপসমপন্ন নহেন, যথার্থ বিনয়ধর্ম মানিয়া চলেন না এবং বিশ বৎসরের কম বয়স্ক ব্যক্তিও উপসম্পন্ন হইতে পারেন না। সেই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিম্নতম বিশ বৎসরেই উপসম্পদা গ্রহন করিয়াছেন। তিনি নিজেও সতর বৎসর বয়সেই উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার উপসম্পদা বিনয়মতে শুদ্ধ নহে। সেই জন্য তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন এবং ব্রহ্মদেশে কিংবা সিংহলে গিয়া পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ ও বিনয়-ধর্ম শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তদ্ধেতু চট্টগ্রামের তদানীন্তন চন্দ্রমোহন ভিক্ষু মহোদয় বাংলাদেশের বিকৃত বৌদ্ধধর্ম ও বিনয় বহিরর্ভূত ভিক্ষুসংঘের উপসম্পদার বিবরণ এবং বিভ্রান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বৌদ্ধ সমাজের শোচনীয় কাহিনী আরকান প্রাদেশিক সংঘরাজ পণ্ডিত প্রবর প্রথিতযশা বিনয়ধর সারমেধ মহাস্থবির মহোদয়কে জানাইয়া এদেশে পুনরায় থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে আহ্বান করেন। তাঁহার বিনয়-ধর্মের আলাপে চন্দ্রমোহন ভিক্ষু সন্তুষ্ট হইয়া উপসম্পদা পরিত্যাগ করিয়া রাজগুরু সারমেধ মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে তথাকার স্থানীয় ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক নূতন উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর। সেখানে দুইমাস বিনয়-ধর্ম অধ্যায়নকালে কঠিনরোগে আক্রান্ত হওয়ায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রোগ যন্ত্রনা অসহ্য হওয়ায় তিনি চীবর পরিত্যাগ করিলেন। মঘা খনোজা পাঠে জানা যায়, বাড়বকুণ্ডের নিকট চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে নাগরাজ বাসুকী ভগবান (চন্দ্রনাথ পাহাড়) বৌদ্ধদের তীর্থস্থান নামে পরিচিত ছিল। ১৮৫৮

খৃষ্টাব্দের চৈত্রমাসে সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির মহোদয় সশিষ্য তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে সীতাকুণ্ড আগমন করেন। তথায় বোয়ালখালি থানার বৈদ্যপাড়া গ্রামের রাধাচণ মহাস্থবিরের (প্রকাশ রাধুমাথের) সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির রাধাচরণ মহাস্থবিরের সহিত সীতাকুণ্ড হইতে চক্রশালা হইয়া পাহাড়তলী মহামুনি মেলায় আগমন করেন।

সেই সময়ে তিনি সকল শ্রেণীর বৌদ্ধদের সঙ্গে মেলামিশা করিয়া জানিতে পারিলেন যে সমস্তই বিনয় বহির্ভূত তান্ত্রিক মতের কুসংস্কার বাংলাদেশের ভিক্ষু সমাজে ও বৌদ্ধসমাজ প্রচলিত রহিয়াছে। তাঁহার ধর্মসঙ্গত যুক্তি পূর্ণ ও বিনয় সম্মত ধর্মসংস্কারের আলোচনায় সকলেই সন্তুষ্ট হন। মহামুনি মন্দিরের পার্শ্বে তাঁহার জন্য একটি পর্ণকুটির নির্মিত হইল। তাহাতে তিনি প্রায় দুই বৎসরকাল অবস্থান করেন। বড়ুয়া, চাক্‌মাও মগ সমাজে সর্বত্র বিচরণ করিয়া তান্ত্রিকমতের অসারতা প্রমান করেন। ইহার ফলে বৌদ্ধ সমাজ হইতে লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা, কার্তিকপূজা, কালীপূজা, দুর্গাপূজা, শিবপূজা, শীলতাপূজা, শনিপূজা, অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের (আশ্বিনী কুমার দ্বয়ের নাম ঃ- নাসত্য ও দস্র) ব্রত উপবাস, সত্যপীরাদির সিন্নিদান প্রথা প্রভৃতি অবৌদ্ধোচিত কার্যকলাপ তিরোহিত হয়। আর আলোচনার মাধ্যমে ভিক্ষু সংঘের উপসম্পদার ভুল ধরা পড়িল এবং থেরবাদের বিনয়-বিধানমতে প্রকৃত উপসম্পদা গ্রহণের আগ্রহ জন্মিল। তজ্জন্য তাঁহারা সারমেধ মহাস্থবিরকে আবার চট্টগ্রামে আগমনের আহ্বান জানাইলে তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বিনয়কর্মের উপযোগী ভিক্ষুসংঘ নিয়া যথাসময়ে চট্টগ্রামে আগমন করিলেন। তাঁহারা রাউজান থানার পাহাড়তলী গ্রামের আসিয়া পূর্বনির্মিত একই বিহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইবার এখানে বিনয় সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে চট্টগ্রামের ভিক্ষুগণ পুনরায় উপস্পদা গ্রহণ

করিয়া এদেশে থেরবাদের অনুগামী ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা করিবেন। যথাসময়ে থেরবাদের বিনয় বিধান অনুসারে উপসম্পদায় আয়োজন করা হইল। মহামুনি মন্দিরের পূর্বপার্শ্বে হাঞ্চাত্তর গোনার এক পার্বত্যছড়ায় পাহাড়তলী গ্রামের শ্রদ্ধেয় জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবির (প্রকাশ লালমোহন ঠাকুর) ও কমল ঠাকুর, ধর্মপুরের হরিঠাকুর, মির্জাপুরের সুখচান ঠাকুর, গুমানমর্দনের দুরাজ ঠাকুর, দমদমার অভয় শরণ ঠাকুর, বিনাজুরীর হরিঠাকুর–এই সাতজন মহাস্থবির সর্ব প্রথম থেরবাদ সম্মত উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন। রাজগুরু সারমেধ মহাস্থবির দুই বৎসর কাল চট্টগ্রামে অবস্থান করিয়া ভিক্ষুদিগকে বিনয়-ধর্ম শিক্ষা দিলেন। ইতি মধ্যে আরও অনেক ভিক্ষু সশিষ্য তাঁহার নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন। এইভাবে মহাযানী ও তন্ত্রযানী মতবাদ চট্টগ্রাম হইতে অন্তর্হিত হইল এবং তদ্স্থলে থেরবাদ বা হীনযান মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল। নূতন উপসম্পন্ন ভিক্ষুসংঘের নাম হইল সংঘরাজ নিকায়। রাজগুরু সারমেধ মহাস্থবির হইলেন, এই সংঘরাজ নিকায়ের প্রথম সংঘরাজ। সংঘরাজ নিকায় প্রতিষ্ঠার পর তিনি আরকানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু কতিপয় প্রাচীন পন্থী ভিক্ষু পুনরায় সংঘরাজের নিকট উপসম্পদা গ্রহণের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া পৃথক রহিয়া গেলেন তাঁহারা হইলেন মাথের দলের ভিক্ষু বা মহাস্থবির নিকায়ের ভিক্ষু।

তৎপর ব্রহ্মদেশের মিন ডোন রাজা বৃটিশ সরকারের মাধ্যমে মান্দালয়ে ২৪১৫ বুদ্ধাব্দে থেরবাদী পঞ্চম সঙ্গীতিতে যোগদানের জন্য আরকানের সংঘনায়ক সারমেধ মহাস্থবিরকে আমন্ত্রণ জানান। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বর্ষাবাসের পূর্বে সারমেধ মহাস্থবির সশিষ্য মান্দালয়ে উপনীত হন; চিকিৎসার ফলে চন্দ্রমোহন রোগমুক্ত হইয়া উক্ত সংগীতির অধিবেশনকালে মান্দালয়ে গিয়া সংঘনায়ক সারমেধ মহাস্থবিরের নিকট পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রমোহনের

নির্মল স্বভাব ও বিনয়-ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান দেখিয়া তথাকার সংঘসভার সদস্যগণ তাঁহাকে 'পুন্নাচার ধর্ম্মধারী' উপাধি প্রদান করিলেন। ইহার পর হইতে চন্দ্রমোহন 'পুন্নাচার' নামে পরিচিত। সেখানে এক বর্ষাবাস শিক্ষা লাভ করেন। তৎপর শ্রদ্ধেয় 'পুন্নাচার' চট্টগ্রামে স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁহার গুরুদেব সারমেধ মহাস্থবির কর্তৃক পূর্ব প্রতিষ্ঠিত সংঘরাজ নিকায়ে যোগদান করিলেন। তাঁহার গুরুদেবের সম্মতিক্রমে নবগঠিত সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষু সংঘ তাঁহাকে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আচার্যপদে অর্থাৎ সংঘরাজ পদে বরণ করিলেন। আচার্য পূর্ণাচার মহাস্থবির বাংলা, পালি, হিন্দি, বার্মা ও সিংহলী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সেই সকল ভাষায় তিনি অনর্গল ভাবে ধর্মদেশনা করিতে পারিতেন। তাঁহার ধর্মদেশনায় বিমুগ্ধ হইয়া চট্টগ্রামে আরও বহুস্থবির ও মহাস্থবির নূতন উপসম্পদা গ্রহণে এই সংঘরাজ নিকায়ভূক্ত হইলেন। তিনি পাহাড়তলী, সাতবাড়িয়া, উনাইনপুরা প্রভৃতি স্থানে বর্ষাবাস করিয়া দলমত নির্বিশেষে বিনয়-ধর্মে প্রচার করেন। এতাদৃশ কার্যকলাপের ফলে তিনি সর্বত্র 'আচরিয়' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। এক সময়ে পূর্ণাচার (পালিশব্দ পুন্নাচার) পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে বোমাং রাজ্যে ধর্ম প্রচার করিতে গমন করেন। সেখান থেকে তিনি চৈত্র সংক্রান্তি তে চাক্মা রাজ্যের রাজধানী রাঙ্গুনীয়া থানার রাজানগর রাজবিহারে উপনীত হইলেন তাঁহার উপদেশে কালিন্দীরাণী মহোদয়া শ্রদ্ধান্বিতা হইয়া স্বজাতি, পাত্র মিত্র সহ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম অভ্যুদয়ের নিমিত্ত তিনি একটি ঐতিহাসিক ভিক্ষুসীমা প্রতিষ্ঠা করিতে প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে রানী মহোদয়া সম্মত হইলেন। তৎপর তাঁহার আমন্ত্রণে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ৭ই চৈত্র সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির প্রমুখ আরকান ও রামু হইতে পঁচিশজন শীলবান মহাস্থবির ইহাতে যোগদান করিলেন। চট্টগ্রাম হইতে আহুত

ভিক্ষুদিগকে সম্মিলিত করিয়া ইছামতী নদীর উদক-উক্ষেপ সীমায় কর্মবাক্য শুনাইয়া পরিশুদ্ধ করিয়া লইলেন। তৎপর যথাসময়ে পঁচিশজন শীলবান মহাস্থবিরের সহযোগিতায় 'সুমঙ্গল রত্ন সীমা' নামে সর্বপ্রথম ভিক্ষুসীমা রাজানগরে বুদ্ধ মন্দির ও রাজবিহারের মধ্যস্থানে প্রতিষ্ঠাপিত হইল। এই উপলক্ষে আচার্য (পালি শব্দে আচরিয়) মহোদয় রাজগুরুরূপে বহু ভিক্ষু শ্রামণের সহ রাজানগর রাজবিহারে প্রায় তিন বৎসর কাল বর্ষাবাস যাপন করেন। এই সময়ে রাঙ্গুনিয়া থানা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বহু প্রাচীন পন্থী ভিক্ষু তাঁহার নেতৃত্বে সংঘরাজ নিকায়ভুক্ত হইলেন। সেই সময়ে কালিন্দী রাণী মহোদয়া বাংলাদেশের আগত ও অনাগত সকল শ্রেণীর ভিক্ষু সংঘকে শাক্যমুনি মেলা উপলক্ষে বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে নব বৎসরের প্রথম দিন স্থায়ীভাবে রাজানগর রাজ প্রাসাদ নিমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। তাহা ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইল। তৎপর আরও রাণী মহোদয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামের কবি ফুল চন্দ্র লোখক কর্তৃক ব্রহ্মভাষায় লিখিত 'থাধুথাং' নামক পুস্তক বাংলা ভাষায় সুললিত কাব্যগ্রন্থ অনুরোধ করাইয়া 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' নাম দিয়া বুদ্ধের জীবনী প্রকাশ করেন। কালিন্দী রাণী সংঘরাজ দলীয় ভিক্ষুগণ সহযোগে তাঁহার গোলবর্দিনী হস্তীসহ ১৮টি হস্তী নিয়া এক শোভাযাত্রা সহকারে রাজানগর প্রদক্ষিণ করতঃ সদ্ধর্মের জন্য 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা' বিনামূল্যে বৌদ্ধ সমাজে বিতরন করেন। ইহাই হইল বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। রাজানগরে ভিক্ষুসীমা প্রতিষ্ঠার পূর্বে চট্টগ্রামে বা বাংলাদেশের অন্য কোন জেলায় প্রকৃত পক্ষে কোন ভিক্ষুসীমা ছিল না। ইহার পর পূর্ণাচার মহাস্থবিরের উদ্যোগে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পাহাড়তলী গ্রামের মহামুনি মন্দির পার্শ্বে ভিক্ষু সীমা প্রতিষ্ঠাপিত হয়। উহা বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ঐতিহাসিক দ্বিতীয় ভিক্ষুসীমা।

বৃটিশ রাজত্বকালে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই মহান আচার্য পূর্ণাচার মহাস্থবির ছিলেন বিনয়-ধর্ম বহির্ভূত বিপথগামী কুসংস্কারাচ্ছন্ন বৌদ্ধ সমাজে বাংলাদেশে থেরবাদ প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম অগ্রদূত এবং তাঁহার গুরু আরকান প্রদেশের সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের পর এখানকার সংঘরাজ নিকায়ের দ্বিতীয় সংঘরাজ। আজিকার দিনে বৌদ্ধজাগরণ স্রষ্টা এই স্বনামখ্যাত মহাপুরুষের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ তাঁহারই নামানুসারে চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কলেজের নিকটবর্তী দেবপাহাড়ে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে 'পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধবিহার" প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। চট্টগ্রামে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ার পর অবশিষ্ট ভারত তথা বিশ্বের সাথে পুনরায় বাঙ্গালী বৌদ্ধদের পরিচয় ঘটে।

মহাবর্গ পাঠে জানা যায়, ভগবান বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের বিশ বৎসর পর রাজগৃহে সতর জন বালক পরস্পর বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। তাহারা এক সঙ্গে ভিক্ষুদের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভের পর পরদিন প্রত্যূষে ঘুম হইতে উঠিয়া খাওয়ার জন্য রোদন করিতে লাগিল। তাহারা ছিল প্রত্যেকেই বিশ বৎসরের কম বয়স্ক। ভগবান বুদ্ধ তাহা জানিতে পারিয়া ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, বিশ বৎসর এর কম বয়স্ক ব্যক্তি শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা,, দুঃখপ্রদ শারীরিক বেদনা সহ্য করিতে পারে না। তজ্জন্য ভগবান বুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ প্রজ্ঞপ্তি করিলেন যে বিশ বৎসরের কম বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিলে সে অনুপসম্পন্ন থাকিবে এবং উপসম্পদাতাদের "পাচিত্তিয় ও দুক্কট" অপরাধ হইবে।

বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর রাজত্বকালে রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত নজরের টিলা গ্রামের তিরতন মুৎসুদ্দী (প্রকাশ তিতন মুৎসুদ্দী), অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকার দেওয়ান রাজা-রাজবল্লভের রাজস্টেটের পক্ষ হইতে তাঁহার কর্মদক্ষতায় ও সৎচরিত্রগুণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে

মুৎসুদ্দী উপাধিতে বিভুষিত করা হয়। এই সনদ প্রাপ্ত হইয়া সেই সময় হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার বংশধরগণ মুৎসুদ্দী উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তিনি ছিলেন দানবীর, শীলবান, সদ্ধর্ম পরায়ন, নির্ভীক, দৃঢ়মনোবল-সম্পন্ন ও সমাজ হিতৈষী কর্মী। তিনি স্বীয় প্রতিভা বলে বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। তাঁহার সুনাম ও সুখ্যাতি তদানীন্তত চাকমারাজা ধরমবক্স খাঁরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি ধাতুদ্রব্য এবং মানবের নিত্য ব্যবহার্য যাবতীয় উপকরণ সমূহ পৃথক পৃথক ভাবে স্বামী স্ত্রী উভয়ের (তিরতন মুৎসুদ্দী ও তাঁহার সহধর্মিনী) সম ওজন তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দান করতঃ 'তুলা পুরুষঃ নামক ধর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠানে ৯০ দিন ব্যাপী স্থায়ী ছিল। ৯০ দিন যাবৎ চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সফলের জন্য অন্নসূত্র খুলিয়া দেওয়া হয়। তিনি সৈয়দবাড়ী, ইছামতি, নজরেরটিলা ও কদমতলী গ্রামে এক একখানা বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধ জন সাধারণেরপূজা অর্চনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই প্রবল প্রচেষ্টায় ও উৎসাহে বৌদ্ধদের শোচনীয় অন্ধকার যুগে সদ্ধর্মের প্রতিজন সাধারণেঃ মধ্যে ধর্মীয় আলোকপাত সৃষ্টি করেন। তিনি স্থানে স্থানে সভাসমিতি করিয়া তাঁহার মানবতার মহান আদর্শে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বৌদ্ধ সমাজে সদ্ধর্মের পুনর্জাগরণ আনয়ন করেন এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজগ্রামে একখানা আদর্শ বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। এইরূপে সমাজ সংস্কারে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করেন। স্বজাতির সেবায় বৌদ্ধ সমাজে তুলাপুরুষ দান ধর্মপরায়ণ বদান্যপ্রবর তিরতন মুৎসুদ্দীই একমাত্র সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বৌদ্ধদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার যুগের সদ্ধর্ম জাগরণ স্রষ্টা রাজগুরু সংঘনায়ক সারমেধ মহাস্থবির ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৮১ বৎসর বয়সে ৬১ তম উপসম্পদাবর্ষে বৌদ্ধ সমাজকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক

ত্যাগ করেন। এই মহাপুরুষ ভাবী বৌদ্ধ সমাজে চিরস্মরণীয় ও আদর্শস্থানীয় হইয়া স্মৃতির স্বর্ণমুকুরে বিরাজমান থাকিবেন। এই সারমেধ মহাস্থবিরের পথানুসরণে সদ্ধর্মীয় কর্মপ্রতিভায় উনবিংশ শতাব্দীতে পটিয়া থানার উনাইন পুরা গ্রামের বিনয়াচার্য পূর্ণাচার মহাস্থবির এবং কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবির, বোয়ালখালী থানার বৈদ্যপাড়া গ্রামের সুযোগ্য সমাজে হিতৈষী অগ্রমহা পণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির এবং বেঙ্গুরা গ্রামের সুপণ্ডিত বিদ্যোৎসাহী জনদরদী অগ্রমহাপণ্ডিত অধ্যাপক ধর্মবংশ মহাস্থবির, রাঙ্গনিয়া থানার শুকবিলাস গ্রামে রাজগুরু সাধক প্রবল বিদর্শনাচার্য অধ্যাপক ভগবান মহাস্থবির এবং গ্রামের ধর্ম প্রচারে অগ্রদূত কালিকুমার মহাস্থবির, রাউজান থানার পাহাড়তলী গ্রামের নির্ভীক কর্মী/জ্ঞানলঙ্কার মহাস্থবির (প্রকাশ লাল মোহন ঠাকুর এবং গহিরা গ্রামের পণ্ডিত প্রবর বরজ্ঞান মহাস্থবির, পটিয়া থানার সাত বাড়িয়া গ্রামের প্রথিত যশা তেজবন্ত মহাস্থবির, হাটহাজারী থানার মির্জাপুর গ্রামের খ্যাতনামা ধর্মানন্দ মহাস্থবির প্রমুখ ভিক্ষুগণের নাম কুসংস্কার ও তান্ত্রিকতার কুয়াসাচ্ছন্ন বৌদ্ধসমাজে থেরবাদী বুদ্ধশাসনের যুগান্তর আনয়নের জন্য সদ্ধর্মীয় অধিনায়করূপে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং দেখা যায়, ইংরেজ রাজত্বকালে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এক অপূর্ব জাগরণের সূচনা আরম্ভ হয়। এই জাগরণ সম্ভব হইয়াছিল ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসার ফলে। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা এই যুগেরই এক বিরাট স্মরনীয় কীর্তি। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রবল ঝড়ে গয়ার বোধিবৃক্ষটি মাটি হইতে উৎপাটিত হইয়া পড়িয়া যায়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের মিনডোন রাজা বুদ্ধগয়া-মন্দির সংস্কার সাধনকালে জেনারেল ক্যানিংহাম উহার একটি শাখা ঠিক আগের জায়গায় রোপন করেন। আর একটি শাখা বোধিবৃক্ষের ৮০ ফুট উত্তরে রোপন করেন।

বর্তমানে এই বৃক্ষের দ্বিতীয় শাখার পার্শ্বে অদ্যাবধি হিন্দুগণ সমাতনী প্রথায় পিণ্ডদান করে।

এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রিন্সেপ, ক্যানিংহাম, ল্যাসেন ও নরিস এই চতুষ্টয় অনুসন্ধিৎসু প্রাচ্যভাষা তত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের প্রবল প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত অশোক লিপির পাঠোদ্ধার করা হয়। আর পালিভাষায় সুপন্ডিত রবার্ট সিজার চাইলডার কর্তৃক বৃহৎ পুর্ণাঙ্গ পালি অভিধান ইংরেজী ভাষায় সংকলিত হয়। অধ্যাপক রিস ডিভিড্স ইংলন্ডে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পালি টেক্সট্ সোসাইটি স্থাপন করিয়া তাঁহার বিদুষী পত্নী ও অন্যান্য বহু ইংরেজ পণ্ডিতের সাহায্যে রোমক অক্ষরে ত্রিপিটক শাস্ত্রও ইংরেজী ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদ করিয়া এতং দেশের শিক্ষিত সমাজের ও পাশ্চাত্য দেশবাসীর বৌদ্ধধর্মে জ্ঞান লাভের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

সেই সময় চট্টগ্রামে নির্ভীক কর্মবীর সমাজদরদী অগ্রদূত কৃপাশরণ মহাস্থবির কলিকাতায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সমিতি ও বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববৌদ্ধ অন্ধকার যুগের জাগরণ স্রষ্টা সিংহলের গরীয়ান বৌদ্ধনেতা প্রথম ধর্মদূত অনাগারিক ধর্মপাল কলিকাতায় মহাবোধি সোসাইটি ও ধর্মরাজিক চৈত্য বিহার প্রতিষ্ঠা করেন, আর চট্টগ্রামের কৃতী সন্তান রায় বাহাদুর শরচ্ছন্দ্রদাস সি, আই, ই, মহোদয়ও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বুড্ড্স্ট টেক্সট্ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গীয় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সমিতি ও সিংহলের মহাবোধি সোসাইটি এই দুইটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের নিত্যনব জাগরণের ভূমিকা সুদুর প্রসারী।

এতৎ প্রসঙ্গে ধর্মপালের দুর্জয় বৈপ্লবিক কর্ম প্রতিভা আলোচনা করাও বিশেষ প্রয়োজন। বৌদ্ধ ইতিহাসের অন্ধকার যুগে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর সিংহলে জন্ম নিলেন গরীয়ান ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধনেতা

অনাগারিক ধর্মপাল। খৃষ্টান স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ দর্শনের অনুশীলনে তিনি হইলেন আত্মহারা। আশ্চর্য তাঁহার কর্মপ্রতিভা কর্মযোগী ধর্মপ্রাণ যুবক ধর্মপাল মর্মাহত হইলেন, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশীনগর লুম্বিনী প্রভৃতি ভারতের বৌদ্ধতীর্থ স্থানের চরম দুরবস্থা দর্শনে। তিনি দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করিলেন,-"ভারত ভূমির অমুল্যসম্পদ বুদ্ধবাণীর প্রচার ও প্রসারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। আর বৌদ্ধতীর্থ স্থানের পুনরুন্নয়ন করিতে হইবে। তিনি ভগবান বুদ্ধের দীন সেবক।" তাই তিনি প্রতিষ্ঠা করিলেন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটি। তৎপর কলিকাতায় এলবার্ট হলে বিরাট ধর্ম সভায় দিলেন ওজস্বিনী ভাষায় বৌদ্ধ জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে প্রচার কার্যের জন্য প্রকাশিত হইতে লাগিল ইংরেজী ভাষায় মহাবোধি জার্ণাল (মহাবোধি পত্রিকা)। এই মহাবোধি জার্ণাল পৃথিবীর বিভিন্ন পণ্ডিত সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করিল। তৎপর তিনি আমন্ত্রিত হইলেন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার শিকাগো নগরে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে। তিনি বুদ্ধের জন্মভূতি ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধতীর্থ স্থানের চরম দুরবস্থা এবং বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে যেই ভাষণদান করিয়াছিলেন, তাহাতে এই যুবক ধর্মপ্রচারকের গুরুত্বপূর্ণ মর্মস্পর্শী ভাষণে সকলের অন্তরে এক অপূর্ব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। এই নির্ভীক সদ্ধর্মহিতৈষী প্রাণবন্ত যুবক বৌদ্ধধর্মের মর্মবাণী বিশ্বের দরবারে প্রচার করিয়া বিধর্মীদের শাসন-লাঞ্ছিত তদানীন্তন ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বিশ্বের ইতিহাস।

এরূপভাবে প্রচার করিলেন আমেরিকার বিভিন্ন সহরে, লণ্ডন, ফ্রান্স, রোম, চীন, জাপান, কোরিয়া, ইটালি, থাইল্যান্ড, সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশে। ভারতে বৌদ্ধ তীর্থস্থানের দুরাবস্থা ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন আন্তর্জাতিক বৌদ্ধসংস্কৃতি

সংস্থার পরিকল্পনা নিয়া। ধর্মপালের পবিত্র কার্যাবলী, তাঁহার নিরহঙ্কার, অমায়িক ব্যবহার, মহাবোধি পত্রিকা প্রকাশ ও বুদ্ধগয়া মন্দির মামলা প্রচার ইত্যাদি আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করিল বিদগ্ধ আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সমাজের মনে। তাঁহারই প্রবল প্রচেষ্টায় ক্রমে ক্রমে সমস্ত বৌদ্ধ তীর্থ স্থান বৌদ্ধদের অধিকার আসিল এবং সমস্ত বৌদ্ধ তীর্থস্থানে যাত্রীদের ধর্মশালা প্রতিষ্ঠাপিত হইল। এই সকল তীর্থস্থান সংস্কারের জন্য বিভিন্ন বৌদ্ধরাষ্ট্র ও বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে বিপুল আর্থিক সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সৌহৃদ্যতাপূর্ণ মর্মস্পর্ণী ভাষণে ও অপরিসীম প্রচেষ্টায় বহুল প্রচলিত বিলাতী পোষাকের পরিবর্তে লুঙ্গির ন্যায় করিয়া পরা সাদাধুতি, সাদা পাঞ্জাবী ও চাদর সিংহলের জাতীয় পোষাক হিসাবে এবং ইংরেজী অনুকরণে সিংহলীদের নাম রাখার পরিবর্তে জাতকাদিতে বণিত নামের অনুকরণ হিসাবে স্বজাতীয় বৈশিষ্ট্যে স্বীকৃতি লাভ করিল। ধর্মপাল অন্তিম জীবনে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ধর্মীয় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া ভগবান বুদ্ধের সৃষ্টি ভিক্ষুসংঘের অন্তর্ভূক্ত হইলেন। সেই বৎসর তিনি ২৯শে এপ্রিল ৬৯ বৎসর বয়সে সারনাথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার আজীবন আদর্শ চরিত্রবান ব্রহ্মচারী নির্ভীক সহকর্মী ছিলেন মহাবোধি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সিংহলের দেবপ্রিয় বলিসিংহ। অনাগারিক ধর্মপালের জীবমানকালে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া এলবার্ট যাদুঘর পরিদর্শনকালে ভগবান বুদ্ধের অগ্রশ্রাবকদ্বয় শারিপুত্র ও মৌদুগল্যায়ণের দেহধাতু রক্ষিত আবার দর্শনে সেখানকার প্রধান কর্মচারীর সঙ্গে আলাপের মাধ্যমে জানিতে পারিলেন যে ভারত হইতে আনিত উক্ত রক্ষিত আধার। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে ভারতের মুল্যবান সম্পদ ভারতকে প্রত্যার্পণ করার জন্য বৌদ্ধদের পক্ষে দেবপ্রিয় বলিসিংহ

ইংরেজ সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার প্রবল প্রচেষ্টায় রক্ষিত ধাতু সমূহ ইংরেজ সরকার ভারত সরকারের মাধ্যমে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যার্পন করেন। এই রক্ষিত ধাতুসমূহ বিপুল মহাসমারোহে সাঁচীর বিহারে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থানেই ভগবান বুদ্ধের জীবমানকালে শারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ণের ধাতুসমূহ সাঁচীর স্তুপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আর একজন শ্রীলঙ্কার কৃতীসন্তান ডক্‌টেরেট জি, পি, মালালাশেখর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে 'বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংস্থা' স্থাপন করিয়া বিশ্বের সমগ্র বৌদ্ধদের সাথে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সুনাম অর্জন করিয়া বিশ্ব বৌদ্ধ সমাজের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে বাংলাদেশের সংখ্যা লঘিষ্ঠ বৌদ্ধসম্প্রদায় বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

আর কলিকাতায় ধর্মাঙ্কুর বিহার প্রতিষ্ঠার পর কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবির লক্ষ্ণৌ, দার্জিলিং, শিলং প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বিহার ও শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করেন। সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গে রাঙ্গুনিয়া থানার শিলক গ্রামের কবিধবজ গুণালঙ্কার মহাস্থবির এবং পরিব্রাজক কালিকুমার মহাস্থবির, বোয়ালখালি থানার ছতর পুটিয়া গ্রামের স্বামী পূর্ণানন্দ মহাস্থবির এই জন কর্মী তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিলেন। প্রচার কার্যের সুবিধার জন্য তাঁহাদের সহযোগিতায় 'জগজ্জ্যোতিঃ' পত্রিকাও প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু পরিব্রাজক কালিকুমার মহা স্থবিরের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল আসামে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধদের মধ্যে পাহাড়তলী গ্রামের বেণীমাধব বড়ুয়া, মহিমা রঞ্জন বড়ুয়া ও রেবতী রমন বড়ুয়া, সর্বপ্রথম এই তিন জন এম, এ, পাশ করেন। বৌদ্ধ জাতির পৃষ্ঠপোষক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে কৃপাশরণ

মহাস্থবির সরকারের বৃত্তি লইয়া বেনীমাধব বড়ুয়াকে উচ্চ শিক্ষার জন্য লণ্ডনে প্রেরণ করেন। তিনি ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাহিত্যে ডক্টরেট (ডি, লিট.) উপাধি লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কৃপাশরণ মহাস্থবিরের প্রচেষ্টায় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে স্কুল, কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষা প্রবর্তিত হয়। সেই সময়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ডক্টর বেনীমাধব বড়ুয়াকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, স্বামী পূর্ণানন্দ মহাস্থবির ও ভগবান মহাস্থবিরকে সহকারী পালি অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করেন। সেই সময়ে টোলে ও পালি বাসা প্রবর্তিত হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জ যুবরাজ অবস্থায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারত ভ্রমনে আগমন করেন। বাংলার গভর্ণরের আমন্ত্রণে কৃপাশরণ মহাস্থবির, গুণালঙ্কার মহাস্থবির ও কালিকুমার মহাস্থবির যুবরাজকে শুভাশীষ প্রদানের জন্য কলিকাতার রাজদরবারে গমন করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে অতিষিক্ত হন। উক্ত রাজদরবারেও এই মহাপুরুষত্রয় আমন্ত্রিত হইয়া সম্রাটের মঙ্গল কামনা করেন। বাঙ্গালী বৌদ্ধভিক্ষুদের পক্ষে এইটিই রাজদরবারে সর্বপ্রথম সম্মান লাভ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আন্তর্জাতিক সুখ্যাতি সম্পন্ন দার্শনিক ও সাহিত্যিক পণ্ডিত প্রবর ত্রিপিটকাচার্য ডক্টর বেনীমাধব বড়ুয়া ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত অশোক শিলালিপির নির্ভুল পাঠোদ্ধার ও প্রাকৃত ধর্মপদের অনুবাদ করেন। আরও তিনি অশোকের জীবনী, বৌদ্ধগ্রন্থকোষ এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় বিবিধ বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়া দেশবিদেশে প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন সুপরিচিত লেখক এবং বাংলা ইংরেজী-পালি ভাষার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা।

পাহাড়তলী গ্রামের পরলোকগত ডক্টর বেণী মাধব বড়ুয়ার পরবর্তী পালি ভাষাবিদ হইলেন ফটিকছড়ি থানার ধর্মপুর গ্রামের ধর্মাদার

মহাস্থবির, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ত্রিপিটক বিশারদ। তিনি পালি-বাংলা-হিন্দি ভাষায় গভীর জ্ঞান সম্পন্ন সুপণ্ডিত এবং রাঙ্গুনিয়া থানার নজরের টিলা গ্রামের তর্কবাগীশ সুপণ্ডিত দার্শনিক সত্যদর্শন প্রণেতা বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের সুযোগ্য শিষ্য। তিনি বর্তমানে কলিকাতা ধর্মাঙ্কুর বিহারের অধ্যক্ষ। তিনি ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে হইতে সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যাপক পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ভারতীয় পণ্ডিত রাহুল সাংস্কৃত্যায়ণ কর্তৃক হিন্দি ভাষায় রচিত ও বহু মূল্যবান তথ্য সম্বলিত বৌদ্ধদর্শন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করায় এবং পাঠক করায় এবং পাঠক জনসাধারণের নিকট পরিবেশিত হওয়ার পণ্ডিত সমাজের বিপুল শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। কেননা এই জাতীয় গ্রন্থ অনুবাদের জন্য বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদর্শনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন। তিনি বৌদ্ধদর্শন গ্রন্থের মুখবন্ধ অংশে ভারতীয় দর্শনের উন্মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধযুগ এবং বুদ্ধের পরবর্তীকাল দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল যাহা ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে, তিনি তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া দর্শন শাস্ত্র পাঠকদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আবার তিনি বহু পুরাতন তথ্য সম্বলিত 'সদ্ধর্মের পুরুত্থান' লিখিয়া বাঙ্গালী বৌদ্ধ জনসাধারণের বিভ্রান্ত ধারণার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। তিনি শাসনবংশ, মিলিন্দপঞ্চহ, ধর্মপদ, মঞ্জিয় নিকায় ২য় খণ্ড, অধিমাস বিনিশ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রণেতা এবং পালি-হিন্দি-বাংলা ভাষায় চিত্তাকর্ষণ মূলক সুবক্তা।

বৌদ্ধ সমাজের স্বনামধন্য নেতা পটিয়া থানার সাতবাড়িয়া গ্রামের স্বাধীনচেতা নাজির কৃষ্ণ চৌধুরী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের চট্টগ্রামে 'বৌদ্ধ সমিতি' স্থাপন করেন। তিনি নির্বাচিত হইলেন এই সমিতির সম্পাদক এবং চকরিয়া থানার হারভাং বিহারের তেজস্বী আরকানী ভিক্ষু গুণ মেজু মহাস্থবির মহোদয় নির্বাচিত হইলেন উক্ত সমিতির প্রথম

সভাপতি। তাঁহারা পাহাড়তলী গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবী কালিকিঙ্কর মুচ্ছদ্দীর সম্পাদনায় 'বৌদ্ধ বন্ধু' নামে একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া সমাজের অভাব অভিযোগ প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া সভাসমিতি করিয়া টাকা পয়সা, ধন সম্পত্তি, বিদ্যাবুদ্ধি অর্জনের জন্য বৌদ্ধ জনসাধারণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ নাজির ও গুণমেজু মহাস্থবিরের পরলোক গমনের পর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম শহরের জেল ডাক্তার রাউজান থানার হোয়ারাপাড় গ্রামের ভগীরথ বড়ুয়া হইলেন বৌদ্ধ সমিতির সম্পাদক এবং পাহাড়তলী গ্রামের জমিদার হরগোবিন্দ মুচ্ছদ্দী হইলেন বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি। তাঁহাদের প্রবল প্রচেষ্টায় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম শহরের নন্দন কাননে একখানা বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়। এই বিহারে বোয়ালখালি থানার বেঙ্গুরা গ্রামের অগ্রমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন। এই সমিতির সম্পাদক ভগীরথ ডাক্তারের সক্রিয় উদ্যোগে পাহাড়তলী গ্রামের মহিমারঞ্জন বড়ুয়া এম, এ, মহোদয়কে চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট কলেজে পালি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং অগ্রমহাপণ্ডিত ধর্মস্থবিরের নিঃস্বার্থ পরায়ণতার কার্যকলাপ ও সততার জন্য বৃটিশ সরকার তাঁহাকে 'অগ্রমহাপণ্ডিত' উপাধিতে বিভূষিত করেন। এই সমিতির সুপারিশক্রমে পাহাড়তলী গ্রামের বেরতী রমন বড়ুয়া এম, এ, মহোদয়ও ডেপুটিম্যাজিস্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত হইলেন। আর সমাজ হিতৈষী পাহাড়তলী গ্রামে বারিষ্টার ডক্টর অরবিন্দ বড়ুয়া এম, এ, পি, এইচ, ডি, (লণ্ডন), বার, এট, ল, ইংরেজ রাজত্ব কালে অভিবক্ত বাংলায় সর্ব প্রথম বৌদ্ধ সমাজ হইতে প্রাদেশিক পরিষদে সদস্যপদ লাভ করিয়া যুক্তি প্রদর্শন বৌদ্ধ সমাজের শিক্ষা বিস্তারের জন্য তৎকালীন বৃটিশ সরকার হইতে সর্বপ্রথম বার্ষিক দশ হাজার টাকা বৃত্তিলাভ করেন। প্রাদেশিক পরিষদে সদস্যপদ লাভের পর তিনি হইলেন

কলিকাতা করপোরেশনের চীপ এডুকেশন অফিসার।

আর এক দিক্‌পাল বোয়ালখালি থানার বৈদ্যপাড়া গ্রামের অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন মহানগরীতে গিয়া প্রবাসী বাঙ্গালী বৌদ্ধদের জন্য 'ধর্মদূত বিহার' প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে একখানা 'বৌদ্ধমিশন প্রেস' স্থাপন করেন। সেই প্রেস হইতে প্রচার কার্যের জন্য সংঘশক্তি' নামে একখানা বৌদ্ধ পত্রিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। আরও এখান হইতে বাংলা ভাষায় বৌদ্ধধর্মের বিপুল পালিগ্রন্থ ছাপা অক্ষরে প্রকাশিত হইতে লাগিল। বাংলা ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপারে শীলালঙ্কার মহাস্থবির, বংশদীপ মহাস্থবির প্রভৃতি কয়েকজন মহাস্থবিরের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধের যোগনীতি, নিবর্দন ভাবনা, আর্যসত্য, ধর্মপদ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁহার আচার, আচারণ ও সদ্ধর্মের উন্নতিজনক কার্যাবলী জানিতে পারিয়া ব্রহ্মদেশ সরকার তাঁহাকে 'অগ্রমাপণ্ডিত' উপাধিতে বিভুষিত করেন। আবার তাঁহার প্রবল প্রচেষ্টায় ও প্রচারকার্যে বৌদ্ধদের অন্ধকার যুগের প্রাচীন বিকৃত বিবাহ পদ্ধতি সংস্কার সাধনে বর্তমান আকারে পালিভাষায় রুচিসম্মত প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতিও প্রবতিত হয়। ইহাও তাঁহার সমাজ সংস্কারের শ্রেষ্ঠ অবদান।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বোয়ালখালি থানার স্বনামধন্য প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, পটিয়া থানার বংশদীপ মহাস্থবির ও জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির এবং রাঙ্গুনিয়া থানার রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির ও ধর্মনন্দ মহাস্থবির,-এই পাঁচজন মহাস্থবির সিংহলের সদ্ধর্মোদয় পালি পরিবেণে একসঙ্গে বিনয় ধর্মে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহারা সিংহলে অবস্থানকালে তথাকার কঠিন চীবর দানোৎসব ও ধর্মদেশনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া অতীব সন্তুষ্ট হন। তথাকার কঠিন চীবরদানের অনুকরণে তাঁহারা ভগবান বুদ্ধ প্রবির্তত 'কঠিন চীবর দান' সর্বপ্রথম এতদ্দেশে

প্রবর্তন করেন। এতদ্ব্যতীত ভগবান বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভের পর প্রথম বর্ষাবাসের সময় সারনাথে প্রথম প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘকে বর্ষাবাস পরিসমাপ্তির পরিদিবস হইতে দিকে দিকে গিয়া দেবমনুষ্যগণের সুখ ও কল্যাণের জন্য যে সদ্ধর্ম প্রচার করিতে ভগবান বুদ্ধ নির্দেশ দিয়াছিলেন, এই কঠিন চীবর দান পুনঃরায় এতদ্দেশে প্রবর্তনের ফলে তাহাও প্রতিপালিত হইতেছে।

ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র কর্তৃত্বে ভারতে (বাংলাদেশ-পাক-ভারত রাষ্ট্রে কার্যের বিশৃঙ্খল দেখিয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। বৃটিশ সরকারও প্রায় দুইশত বৎসর রাজত্ব করার পর ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট তারিখে আমাদের দেশ স্বাধীন হয় এবং 'কায়েদ-ই আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র নেতৃত্বে পাকিস্তান কায়েম হয়। তখন এই ভারত বর্ষ ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্তান এই দুই ভাগ বিভক্ত হয়। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর পাকিস্তান মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হইলে রাষ্ট্র পরিবর্তনের যুদ সন্ধিক্ষণে চট্টগ্রাম জর্জ কোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত উকিল পাহাড়তলী গ্রামের উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দীর বলিষ্ঠ সহযোগিতায় 'পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ এর জনপ্রিয় নির্ভীক সমাজ কর্মী সভাপতি বিশুদ্ধানন্দ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ এর জনপ্রিয় নির্ভীক সমাজ কর্মী সভাপতি বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের নেতৃত্বে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে রাঙ্গুনিয়া থানার পশ্চিম শিলক গ্রামে বৌদ্ধদের এক সংকটময় মুহূর্তে বৌদ্ধ মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় ইহাও পরম গৌরবের সহিত উল্লেখ করা যাইতে পারে, এখানেই বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সর্বপ্রথম সূচনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠাপিত হয়। সেই বৌদ্ধ মহাসভায় পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার মহোদয় যোগদান করেন। তাঁহার মাধ্যমে বৌদ্ধদের অভাব অভিযোগ উল্লেখ পূর্বক অভিনন্দন পত্রে পূর্ব

পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বৌদ্ধ সমাজের হিতার্থে অভিনন্দন পত্র অনুযায়ী সর্ববিধ প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তৎকালে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধেরা 'স্বতন্ত্র জাতি' বলিয়া পাকিস্তান সরকারের স্বীকৃতি লাভ করিল।

তৎপর বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির মহোদয়ের প্রবল প্রচেষ্টায় পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন পূর্বক আন্তর্জাতিক বিশ্বরাষ্ট্র সমূহের সঙ্গে পাকিস্তানের বৌদ্ধদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আরও তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকানগরীর কমলাপুরে বৌদ্ধদের প্রচার কার্যের জন্য বিপুলভারী পরিকল্পনা সহকারে একখানা সুশোভিত বিরাট এলাকায় (সাড়ে চারি একর বাস্তুভিটাতে) ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে 'কমলাপুর ধর্মরাজিক বৌদ্ধবিহার' প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে 'কৃষ্টি নামে একখানা বৌদ্ধপত্রিকা প্রকাশিত হইয়া প্রচার কার্য চালান হইতেছে। আরও বৌদ্ধ অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্য রাউজান থানার পূর্বগুজরা গ্রামের হোয়ারা পাড়ায় সরকার সাহায্য প্রাপ্ত 'অনাথ আশ্রম' স্থাপন করিয়া বৌদ্ধ সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য সুগতানন্দ মহাস্থবিরের সম্পাদনায় মাসিক 'নব সমতট' পত্রিকায় বৌদ্ধ সমাজের নিত্যনুতন খবর পরিবেশিত হওয়ায় আরও অধিকতর কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। আবার বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির মহোদয় ঢাকা কমলাপুর বিহারেও তথাকার অনাথ ছেলেদের জন্য অনাথ আশ্রম ও কমলাপুর ধর্মরাজিক আবাসিক অনাথ উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের বৌদ্ধদের জাতীয় প্রেস না থাকায় জাতীয় প্রেসের মাধ্যমে সমাজর কল্যাণ কর প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি প্রচারের জন্য বিশ্লেষণ করায় শ্যামরাজ্য তাঁহাকে উক্ত বিহারে তাঁহারই প্রতিষ্ঠাপিত অনাথ আশ্রমে বৌদ্ধগ্রন্থাদি মুদ্রণের জন্য একখানা মূল্যবান প্রেস বিনা মূল্যে প্রদান করেন। তদুরূপ জাপান সরকারেরও

দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জাপান হইতে বহু মূল্যবান প্রেস বিনা-মূল্যে দানে প্রাপ্ত হইয়া চট্টগ্রাম শহরের ঘাটফরহাদবেগে উক্ত প্রেস স্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশের সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডের সচিব। তাঁহার প্রচেষ্টায় টোলের ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্কৃত ও পালি পরীক্ষা দেওয়ার সুবিধার্থে রাউজান থানার পূর্বগুজরা গ্রামের হোয়ারাপাড়া বিহার ও ঢাকা কমলাপুর বিহারে 'পরীক্ষা কেন্দ্র' স্থাপনের জন্য তিনি সরকারের অনুমতি লাভ করেন। তিনি সেখানে আরও জাতির শিক্ষা বিস্তারের জন্য 'হোয়ারাপাড়া অনাথ উচ্চ বিদ্যালয় ও বালিকা মহাবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন এবং পুরাতন সুদর্শন বিহার সংস্কার সাধন করিয়া ভাবী পরিকল্পনা সহকারে বিহার সীমার চতুর্দিকে পাকা দেওয়ালের বেষ্টনীসহ সুশোভিত দ্বিতল নূতন বিহার বৃহদাকারের নির্মিত হইয়াছে। তাঁহার নিঃস্বার্থ পরায়ণতার কার্যকলাপ দর্শনে তাঁহাকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে 'তকমা-ইখিতমত' এবং পরে 'কমকা-ই-পাকিস্তান' এই সম্মানিত উপাধিতে বিভূষিত করেন।

ইহাও পরম গৌরবের সহিত উল্লেখ করা যাইতে পারে, মহামান্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির মহোদয়ের কালোপযোগী যথোচিত বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তাঁহার বিশাল কর্ম সাধনার সুযোগ্য কর্মবীর সমাজহিতৈষী উত্তরসূরি পণ্ডিত প্রবর শিষ্যদ্বয় ঢাকা কদমপুর ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারের যাবতীয় কর্মসূচীর কার্য রাঙ্গুনিয়া থানার পদুয়া গ্রামের শুদ্ধানন্দ মহাস্থবির মহোদয় এবং রাউজান থানার পূর্বগুজরা সুদর্শন বিহারের যাবতীয় কর্মসূচীর কার্য পুর্বোক্ত গ্রামের সুগতানন্দ মহাস্থবির মহোদয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। তাঁহাদের যথাযোগ্য নিঃস্বার্থ কার্যকলাপে ও অমায়িক ব্যবহারে তাঁহারা সকলেরই অশেষশ্রদ্ধা ভাজন হইয়াছেন। তাঁহাদের নিরলস অনাবিল কর্ম প্রতিভা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এতৎসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে

বৌদ্ধ সমাজের কল্যাণমিত্র মহামান্য বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর শিষ্য ও ভক্তরা পূর্বগুজরা হোয়ারাপাড়া সুদর্শন বিহারে তাঁহার ত্রিসপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন কালে বিপুল জনসমাগমে ১৯৮১ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া বৌদ্ধ সমাজের দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে রেজিষ্টার্ড যোগে 'মহামান্য বিশুদ্ধানন্দ মহাথের স্মৃতিকল্যাণ তহবিল" গঠন করিয়াছেন। ভবিষ্যতের প্রাপ্ত দানও উক্ত তহবিলে জমা দিয়া আরও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে। এই সুসংবাদ বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজের পরম গৌরবের শুভ বার্তা। তজ্জন্য "মহামান্য বিশুদ্ধানন্দ মহাথের স্মৃতিকল্যাণ সংস্থা" অশেষ ধন্যবাদ ও অফুরন্ত কৃতজ্ঞার পাত্র।

আবার ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে রাউজান থানার অন্তর্গত 'পাহাড়তলী মহামুনি উচ্চ বিদ্যালয়' এর প্রধান শিক্ষক এবং হাটহাজারী থানার মির্জাপুর গ্রাম নিবাসী বাবু সুধাংশু বিমল বড়ুয়া বি, এ, বি, টি, মহোদয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদে নির্বাচিত হওয়ার পর ২৫০০ বুদ্ধাব্দে (১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে) পৃথিবীর বিভিন্ন বৌদ্ধরাষ্ট্রে বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসব বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনিও তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া পাকিস্তান সরকার হইতে বিপুল আর্থিক সাহায্য লাভ করেন এবং বিভিন্ন বৌদ্ধ রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে তৎকালীন পাকিস্তানের বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসবে যোগদানের জন্য পাকিস্তান সরকারের পক্ষ হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার ও কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের নেতৃত্বে মহাসমারোহে পাকিস্তানেও 'বুদ্ধ জয়ন্তী সুসম্পন্ন হয়। আরও তিনি বৌদ্ধদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইংরেজ আমলের বরাদ্দকৃত দশ হাজার টাকা বৃদ্ধি করিয়া তদ্‌স্থলে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্ত হইয়া বিচক্ষণ

বুদ্ধিমত্তা ও অসীম কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

বর্তমানে এই বিংশ শতাব্দীতেআর একজন বাঙ্গালী ভিক্ষু হইলেন নির্ভীক নিরলস সুদক্ষ কর্মবীর, সদ্ধর্মজাগরণ স্রষ্টা জিনরতন মহাস্থবির। তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র হইল আসামে। তাঁহার জন্ম স্থান চট্টগ্রাম জেলায় চান্দগাঁও থানার চান্দগাঁও গ্রামে। তিনি শিল্পবহুল সুশোভিত জনাকীর্ণ পল্লীগ্রাম হইতে আসামে গিয়া সমগ্র প্রতিকূলতার মাধ্যমে অদম্য মনোবল সম্পন্ন কর্মপ্রতিভা বলেই নিজেকে তথায় চিত্তাকর্ষনী সদ্ধর্ম প্রচারে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। তিনি আসামে পাথিয়াল, নাগা, সিম্পু, শ্যাম, খামতি, লামা প্রভৃতি জাতির সঙ্গে অকপট আন্তরিকতার সহিত মেলামিশার মাধ্যমে সদ্ধর্ম প্রচার করিয়া আসামের গৌহাটি, জোরহাট, মরিহানি, লামডিন, শিবসাগর, তিনসুকিয়া, তেজপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বিহার ও শাখাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশ বিদেশে সুনাম অর্জন করিয়াছেন। তিনি ছিলেন সদ্ধর্ম প্রচারে দৃঢ়মনোবলসম্পন্ন হৃদয়গ্রাহী সুবক্তা। তাঁহার এতাদৃশ কর্মতৎপরতার ফলে আসামেও বৌদ্ধদের সংখ্যা বিপুল পরিদৃষ্ট হয়। ইহাও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ধর্ম বিজয়ের গৌরবময় শুভবার্তা তিনি তথাকার 'বেঙ্গল বুডিষ্ট এসোসিয়েশন' এর সভাপতি এবং অখিল ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার অনুনায়ক।

বর্তমানে কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার বরইগাঁও গ্রামের আন্তর্জাতিক সুখ্যাতিসম্পন্ন সুপণ্ডিত বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা জ্যোতিপাল মহাস্থবির স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ত্রিপিটক বিশারদ মহোদয় হইলেন বাংলাদেশ সম্বোধি সোসাইটির সহকারী সভাপতি এবং এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থার বাংলাদেশ জাতীয় কেন্দ্রের চেয়ারম্যান। তিনি বরইগাঁও পরিবেশের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ। আরও তিনি বরইগাঁও গ্রামে অনাথ আশ্রম ও উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং উক্ত বিদ্যালয়ের পালি শিক্ষক। তিনি অভিধর্ম পিটকের চতুর্থ গ্রন্থ

'পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি' (পুদ্‌গল প্রজ্ঞপ্তি) ও মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'বোধিচর্যাবতার'-এই দুইটি জটিল গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহার রচিত 'কর্মতত্ত্ব ও প্রজ্ঞাভূমি নির্দেশ' বৌদ্ধ দর্শনের আর দুইটি গভীর রহস্যপূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে তাঁহার সমুজ্জ্বল গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলিয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থার পঞ্চম সাধারণ অধিবেশনে মর্মস্পর্শী বহুমূল্যবান তথ্যপূর্ণ ভাষণ দিলেন ওজস্বিনী ভাষায় বৌদ্ধ জীবন ও বৌদ্ধ দর্শনের মাধ্যমে জগতে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। তিনি তাঁহার সেই গুরুত্বপূর্ণ মর্মস্পর্শী ভাষণে শান্তি মঙ্গোলিয়দের ও এশিয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থার সদস্য বৃন্দের চিত্ত জয় করিয়াছেন তাহাতে ইহার ফল প্রতূতি স্বরূপ তাঁহারা তাঁহাকে 'এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সুবর্ণ পদকে' অভিষিক্ত করিলেন। এতাদৃশ মনোমুগ্ধকর গভীর পণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে সুবর্ণপদক প্রাপ্তি বর্তমানে বাঙ্গালী বৌদ্ধ জাতির পক্ষে পরম গৌরব ও বিজয়ের শুভবার্তা।

আর একজন উদীয়মান বিদ্যোৎসাহী নিরলস কর্মী ভিক্ষু হইলেন কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার কোম্পানীর গ্রামের ধর্মরক্ষিত মহাস্থবির। তিনি স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত বিনয় সূত্র বিশারদ। তিনি ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লা শহরের ঠাকুর পাড়ায় কনকস্তুপ বৌদ্ধবিহার ও সম্বোধি পালি বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার প্রবল উৎসাহ দাতা ও সক্রিয় সহকর্মী ধর্মপ্রাণ উপাসক এবং বাংলাদেশ সম্বোধি সোসাইটির আজীবন সম্পাদক ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ বড়ুয়া মহোদয় ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বোয়ালখালি থানার চরণদ্বীপ গ্রামের অধিবাসী এবং বর্তমানে কুমিল্লা শহরের ঠাকুর পাড়ায় কনকস্তুপ বৌদ্ধ বিহারের সন্নিকটে স্থায়ী বাসিন্দা। ধর্মরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয় হইলেন কনকস্তুপ বৌদ্ধ বিহার ও সম্বোধি পালি বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ এবং লালমাই কলেজ ও বাগমারা উচ্চ বিদ্যালয়ের পালি শিক্ষক। তাঁহার

প্রনীত গ্রন্থের মধ্য প্রাচীন বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ অমূল্য রত্ন সম্পদ সংগৃহীত 'ময়নামনীর ইতিকথা' এবং বাঙ্গালী জাতির গৌরবরবি মহাজ্ঞানী মহাসাধকের জীবন চরিত্র 'অতীশ' দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান'-এই দুইটি গ্রন্থ পুরাতত্বের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টার জন্য তিনি উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।

পণ্ডিত প্রবর জ্যোতিঃপাল মহাস্থবির ও তত্ত্বান্বেষী পণ্ডিত ধর্মরক্ষিত মহাস্থবির এই দুইজন ভিক্ষুর অনলস কর্মোদ্যমে, চরিত্রের গাম্ভীর্যে ও অগাধ পাণ্ডিত্যে কুমিল্লা ও নোয়াখালি প্রভৃতি জেলায় বৌদ্ধ সমাজকে শিক্ষাদীক্ষায় ও ধর্মীয় চেতনায় প্রবুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা আত্মোন্নতি মূলক লিখন-পঠন-পাঠন এবং সমাজও সদ্ধর্মের উন্নতিমূলক কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত আছেন। বর্তমানে কুমিল্লা জেলার ময়নামতী নামক স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃতির পীঠভূমি বলিয়া শালবন মহাবিহার ও স্তূপের ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক আবিস্কৃত হওয়ায় এবং সমৃদ্ধ অতীত গৌরবময় অক্ষয় কীর্তির সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন যাদুঘরে সংরক্ষিত হওয়ায় কুমিল্লা সহর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই যুগ সন্ধিক্ষণে সহর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই যুগ সন্ধিক্ষণে কুমিল্লা সহরে মহানুভব ধর্মরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত কনকস্তুপ বৌদ্ধ বিহারও আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে পরিণত হইয়াছে। তজ্জন্য এই বিহারের গুরুত্ব সর্বাধক। আবার ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ তারিখে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আমাদের দেশ নূতন রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হয়। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ এই চারিটি মূলনীতির উপর এইনতুন রাষ্ট্র তথা বাংলাদেশের ভিক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আবার এই দেশ গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামেও অভিহিত হয়। এই সময়ে

স্বাধীনতা লাভের পর বুদ্ধের জন্ম, লাভ ও মহাপরিনির্বাণ লাভ এই ত্রিস্মৃতি বিজড়িত বুদ্ধ পূর্ণিমা তথা বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে সরকারী ছুটি মঞ্জুরী লাভের জন্য বৌদ্ধদের আবেদন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট পেশ করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বৌদ্ধদের এই আবেদন যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া বুদ্ধ পূর্ণিমাকে সর্বসাধারণের ছুটির দিন বলিয়া ঘোষণা করেন। এতদ্‌প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'ধর্ম নিরপেক্ষতা' রাষ্ট্রীয় আদর্শ ঘোষণা করা সত্ত্বেও ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে জাতীয় সংসদে 'কোরানপাঠ-বাইবেল পাঠ, এর সঙ্গে ত্রিপটিক পাঠ করা হইল না। সেই সময়ে জাতীয় সংসদের বৌদ্ধ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তৎকালীন আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি উত্তর দিলেন, -"হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম এক, সুতরাং গীতাপাঠ করিলে আর ত্রিপিটক পাঠ করিতে হয় না।" বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকারকে জাতীয় সংসদে সরাসরি অস্বীকার করা হইল। তজ্জন্য বৌদ্ধ জাতির পক্ষে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রতিবাদ প্রকাশিত হইল,-হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম এক নয়, অনতি-বিলম্বে জাতীয় সংসদে ত্রিপিটক পাঠ করিতে হইবে। এতাদৃশ ন্যায্য দাবির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের নিকট স্মারক লিপিও প্রেরিত হইল। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে তৎপর পরবর্তী অধিবশনে হইতেই ত্রিপিটক পাঠ শুরু হয়।

তৎপর ক্রমশঃ দুর্নীতি, খাদ্যদ্রব্য ও ব্যবহৃত দ্রব্য সমূহের মূল্য অসহনীয় চরম পর্যায়ে উপনীত হইলে ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে আমাদের এই নব গঠিত বাংলাদেশে সামরিক শাসনের অভ্যুত্থান হয় আবার ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় পরিষদ গঠিত হইলে বাংলাদেশে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভন্তে সাধক প্রবল বিনয়ধর সাধনানন্দ মহাস্থবির এবং চাকমা রাজগুরু পণ্ডিত প্রবর সুবক্তা অগ্রবংশ

মহাস্থবিরের শীলপ্রভাবে ও প্রচার কার্যে পার্বত্য চট্টগ্রামেও চাকমাজাতির ধর্মীয় সংস্কার সাধনে তাঁহারা বৌদ্ধ জাতির প্রবল পুনর্জাগরণের গৌরবময় নূতন পদক্ষেপের সৃষ্টি করিয়াছেন। এতৎপ্রভাবে চট্টগ্রামে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের ধর্মীয় যোগসূত্রের সূচনা পরিলক্ষিত হইতেছে।

এইভাবে সদ্ধর্মের পুনরুত্থানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে ভিক্ষুসংঘ ও বৌদ্ধ-সমাজ শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রগতির উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। অনেকে আদ্য-মধ্য উপাধি-স্নাতক স্নাতকোত্তর, এন, বি, সি, এস; এল, এল, বি, বি, এড্; এম, এড্ প্রভৃতি পরীক্ষায় পাশ এবং কয়েক জন রায়সাহেব-রায়বাহাদুর -অগ্রমহাপণ্ডিত ডক্ট্রেট প্রভৃতি উপাধিলাভ করিয়াছেন। শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজে উকিল, ডাক্তার উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, ব্যারিষ্টার, হেড্‌মাষ্টার, প্রিন্সিপ্যাল, প্রপেসার, মুনসেফ, সাবজজ, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিলসার্জন, এসিস্‌টেন্ট সার্জন, স্কুল ইন্সপেক্টর, ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার, পুলিশ ইন্সপেক্টর, ইন্‌কমটেক্স অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার, সুবেদার প্রভৃতি বহু সরকারী বেসরকারী কর্মচারী আছে। আমাদের সমাজ শিক্ষাদীক্ষায় এতাদৃশ উন্নত স্তরে অগ্রসর হইলেও লেখক, পাঠক, জাতীয় পত্রিকা, জাতীয় প্রেস ও ফ্রন্ডের অত্যধিক অভাব এবং বিবাহে অসহনীয় পণপ্রথা প্রবর্তন হেতু বৌদ্ধসমাজের ভবিষ্যৎ জাতীয় জাতীয় মেরুদণ্ড ভাঙ্গনের অঞ্চল্যণকর পন্থায় অবস্থিত। এই যুগসন্ধিক্ষণে বাঁচিতে হইলে ও জাতিকে বাঁচাইতে হইলে চাই সমাজ সংগঠনকারী শিক্ষাপ্রাপ্ত বীর্যবান যুবকদের প্রাণবন্ত যুবশক্তির আন্দোলন, বিদ্যাবুদ্ধি, ধন, উদারতা, নৈতিক চরিত্রের উন্নতি, সর্বোপরি জাতীয় একতা। ধর্মবল বা চরিত্রবল না থাকিলে মানুষ কখনও সুখী হইতে পারেনা। তাই কোমলমতি বালক-বালিকাদের প্রাথমিক ধর্মশিক্ষার জন্য সুদূর অতীত বৌদ্ধযুগের ন্যায়

সুবিধানুসারে বিহারে ধর্মীয় শিক্ষা পুনঃ প্রবর্তন করা অত্যাবশ্যক।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র স্বাধীন ভারতের প্রথম সংবিধান রচয়িতা তদানীন্তন আইন মন্ত্রী লোকান্তরিত তফশীলভুক্ত ডক্টর আম্বেদকর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্বের সকল ধর্ম অনুশীলন করিয়া বৌদ্ধধর্মের উদারতা, অহিংসা ও ভেদাভেদবিহীন মৈত্রীভাব দর্শনে লক্ষ লক্ষ অনুগামী সহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে ভারত রাষ্ট্রে নবদীক্ষিত বৌদ্ধদের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। সকল বৌদ্ধ রাষ্ট্রে ত্রিপিটক শাস্ত্র মাতৃভাষায় অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং মাতৃভাষায়ও ত্রিপিটক শাস্ত্র অনুদিত হইয়াছে। ভগবানবুদ্ধের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারেও বৌদ্ধজাগরণের সময় সমাগত।

উপসংহারে চিন্তাশীল সমাজহিতৈষীগণের দৃষ্টি আর্কষণ পূর্বক সুদূর অতীত বৌদ্ধযুগের মহান ঐহিত্য স্মরনার্থে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, পালিটোলে বৌদ্ধ ছাত্র- ছাত্রীদের এবং শিক্ষকদের অধ্যায়ন ও অধ্যাপনার জন্য বাংলা ভাষায় স্বধর্মীয় পালি গ্রন্থাদির সম্পূর্ণ অভাব। তদ্বেতু গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক আর্থিক সাহায্যলাভ ও বৌদ্ধ জনসাধারণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করতঃ চট্টগ্রামে 'বৌদ্ধমিশন প্রেস' স্থাপন করিয়া বঙ্গানুবাদ সহ সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্র বাংলা ভাষার অক্ষরে প্রচার করা নিতান্ত আবশ্যক। নতুবা বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা অচিরেই বিলুপ্ত হইয়া বৌদ্ধ সমাজ যে বিপদগামী হইবে- ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিতে পারে না। তাই সমাজের ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া বুদ্ধের অহিংসা নীতি অনুসরণে সামগ্রিকভাবে ভাবী বৌদ্ধসমাজের উন্নতিকল্পে বিবেক সহকারে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া নূতন কর্মপন্থা আবিষ্কারে এইযুগে সন্ধিক্ষণে জাতির অগ্রগতির জন্য সত্ত্বর নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেকেরই অপরিহার্য কর্তব্য কর্ম। তাই হইলে মারবিজয়ী তথাগত গৌতমবুদ্ধের দেশিত

আদিকল্যাণ মধ্যেকল্যাণ-অবসান কল্যাণকর শীল-সমাধি প্রজ্ঞাময় সদ্ধর্ম মানব-হৃদয় চির প্রদীপ্যমান নব গৌরবে জাতির জাগরণের স্মৃতি পথে বিরাজমান থাকিবে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে আরকানের প্রাদেশিক সংঘরাজ বিনয়ধর সারমেধ মহাস্থবির কর্তৃক থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার পর যেই সকল ভিক্ষু নূতন উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন, সেই সকল উপসম্পন্ন ভিক্ষু সংঘের নাম হইল সংঘরাজনিকায়। সংঘরাজ নিকায়ের সংঘনায়কদের নাম, সন, স্থান ক্রমান্বয়ে নিম্নে প্রদর্শিত হইল ঃ-

১। সারমেধ মহাস্থবির (আরকান প্রাদেশিক সংঘরাজ) বাংলাদেশের সংঘরাজ নিকায় প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম সংঘনায়ক (১৮৬৪-১৮৭৭)
জন্মস্থান ঃ- চকরিয়া থানার হারভাং।

২। পূর্ণচার মহাস্থবির (১৮৭৭-১৯০৮ খৃষ্টাব্দ)।
জন্মস্থান ঃ- পটিয়া থানার উনাইনপুরা গ্রাম।

৩। জ্ঞানালংকার মহাস্থবির (১৯০৮-১৯২৭)।
জন্মস্থান ঃ- রাউজান থানার পাহাড়তলী গ্রাম।

৪। বরজ্ঞান মহাস্থবির (১৯২৭-১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ)।
জন্মস্থান ঃ- রাউজান থানার গহিরা গ্রাম।

৫। তেজবন্ত মহাস্থবির (১৯৩৬-১৯৪২ খৃষ্টাব্দ।)
জন্মস্থান ঃ- পটিয়া থানার সাতবাড়িয়া গ্রাম।

৬। ধর্মানন্দ মহাস্থবির (১৯৪২-১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে)
জন্মস্থান ঃ- হাটহাজারী থানার মির্জাপুর গ্রাম।

৭। অভয়তিষ্য মহাস্থবির (১৯৫৭-১৯৭৫ খৃষ্টাব্দ)।
জন্মস্থান ঃ- বাঁশখালি থানার মিজরীতলা গ্রাম।

৮। শীলালংকার মহাস্থবির (১৯৭৫.....খৃষ্টাব্দে)।
জন্মস্থান ঃ- ফটিকছড়ি থানার নানুপুর গ্রাম।

মহাস্থবির নিকায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজে বিনয় বহির্ভূত বহু অবৌদ্ধচিত প্রথা প্রচলিত ছিল। তৎদর্শনে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরকানের প্রাদেশিক সংঘরাজ পণ্ডিত প্রবর প্রথিত যশা বিনয়ধর সারমেধ মহাস্থবির কর্তৃক ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বিনয় সম্মত নূতন উপসম্পদা প্রদানে এতৎদেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠাপিত হয়। এই নতুন উপসম্পন্ন ভিক্ষুসংঘের নাম হইল সংঘরাজ নিকায়। যেই সকল ভিক্ষু প্রভাব প্রতিপত্তি ও বর্ষাবাস অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য নূতন উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন না, সেই সকল পুরাতন ভিক্ষুসংঘের নাম হইল মহাস্থবির নিকায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও দেখা গিয়াছে, পাহাড়তলী মহামুনি বিহারে সকল শ্রেণীর ভিক্ষু বিভিন্ন সময়ে মিলিত হইয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করিতেন এবং অনেক জটিল সমস্যাও একত্রে সমাধান করিতেন।

সংঘরাজ নিকায়ের পূর্ণাচার মহাস্থবিরের উপদেশে চাক্‌মারাণী কালিন্দী মহোদয়া কর্তৃক রাঙ্গুনীয়া থানার রাজানগরে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভিক্ষুসীমা প্রতিষ্ঠিত হইলে বাংলাদেশের আগত ও অনাগত শ্রেণীর ভিক্ষুসংঘকে শাক্যমুনি মেলা উপলক্ষ্যে প্রত্যেক বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে বাংলা নববৎসরের প্রথম দিন স্থায়ীভাবে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করার পর বাংলাদেশের সংঘরাজ নিকায় প্রতিষ্ঠাতা সারমেধ মহাস্থবির প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক তাহা সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। সেই সময়ে বিনয়কর্ম ব্যতীত সকলে একত্রে চলাফেরা এবং খাওয়া দাওয়াও করিতেন। মহাস্থবির নিকায়ের ভিক্ষুসংঘ প্রত্যক্ষভাবে সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুসংঘের

সহিত যোগদান না করিলেও তাঁহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না; কিন্তু থেরবাদী সম্মত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রতিযোগিতাই ছিল। পুরাতন মহাস্থবির নিকায়ে তিতন (তিরতন) মহাস্থবির নিকায় ও রামদাস মহাস্থবির নিকায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু সন তারিখ সংগ্রহ করিতে না পারায় দেওয়া গেল না। রামদাস মহাস্থবির ও তিতন মহাস্থবির ছিলেন জ্ঞাতি ভ্রাতা। তাঁহাদের মধ্যে রামদাস মহাস্থবির ছিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং তিতন মহাস্থবির ছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহাদের জন্মস্থান ছিল রাউজান থানার পূর্বগুজরা গ্রামে।

তিতন মহাস্থবির নিকায়ের সংঘনায়কবৃন্দ ঃ

১। হোয়ারা পাড়ার তিতন (তিরতন) মহাস্থবির।

২। শাকপুরার রামধন মহাস্থবির।

৩। লাখেরার অভয় শরণ মহাস্থবির।

৪। হোয়ারা পাড়ার অগ্রসার মহাস্থবির।

রামদাস মহাস্থবির নিকায়ের সংঘনায়কবৃন্দ ঃ

১। হোয়ারা পাড়ার রামদাস মহাস্থবির।

২। পাঁচখাইনের সুমনতিষ্য মহাস্থবির।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তিতন (তিরতন) মহাস্থবির নিকায় এবং রামদাস মহাস্থবির নিকায় একত্র হইয়া তাহা বর্তমান 'মহাস্থবির নিকায়' নামে পরিচিত হইয়াছে। রামদাস মহাস্থবির নিকায়ে ১৭ জন ভিক্ষু ছিলেন। তৎমধ্যে ৫ জন ভিক্ষু সংঘরাজ নিকায়ে যোগদান করিলেন এবং অবশিষ্ট ১২জন ভিক্ষু মহাস্থবির নিকায়ে যোগদান করিলেন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে মহাস্থবির নিকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ক্রমান্বয়ে

সংঘনায়কদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১। পাঁচখাইনের সুমনতিষ্য মহাস্থবির।

২। নোয়াপাড়ার ধর্মজ্যোতি: মহাস্থবির।

৩। নোয়াপাড়ার জয় সুমন মহাস্থবির।

৪। আধার মানিকের প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির।

৫। খৈয়াখালির চন্দ্রজ্যোতিঃ মহাস্থবির।

৬। শাকপুরার ধর্মদর্শী মহাস্থবির।

৭। আবুরখীলের ধর্মপাল মহাস্থবির।

৮। হোয়ারাপাড়ার বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির।

পালি ভাষার উচ্চারণ

আমার বিশ্বাস, এতৎ প্রসঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপে পালি ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে **'চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস'** অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তদ্বেতু বৌদ্ধ সমাজের সুধী মণ্ডলী কর্তৃক যুক্তি সঙ্গত সুবিবেচনার জন্য মৌলিক পালি কচ্চায়ণ ব্যাকরণের মাধ্যমে পালি ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিভীষিকাময় রাষ্ট্রবিপ্লবে নরহত্যা, লুণ্ঠন, ধ্বংসলীলা প্রভৃতি অসহনীয় চরম অমানুষিক বৌদ্ধ নির্যাতনের ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে অন্তহিত হইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে সমস্ত বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আর নিরুপায় হইয়া বৌদ্ধেরা দলে দলে ধর্মান্তরিত হইয়া যায়। সেই সময়ে মগদ্ধ সাম্রাজ্য হইতে প্রাণ ভয়ে পলায়মান বর্জি বংশীয় বহু সংখ্যক বৌদ্ধ র্সবহারা হইয়া বাংলাদেশের কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধ মগরাজার অধীনে আশ্রয় গ্রহণ করে। তদ্ধেতু তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম-কর্ম, প্রভৃতি পূর্ব বৌদ্ধ ঐহিত্য সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহারাই বাংলাদেশে বসবাস হেতু বাঙ্গালী বৌদ্ধ নামে অভিহিত হয়। এই সমাজের অন্ধকার যুগে বাংলাদেশে বিনয়-ধর্ম শিক্ষার জন্য কোন পালি প্রতিষ্ঠান না থাকায় এখানকার ভিক্ষুগণ ব্রহ্মদেশে বিনয়-ধর্ম শিক্ষা লাভ করিতে গিয়া ব্রহ্ম ভাষার উচ্চারণের ন্যায় ব্রহ্ম দেশীয় তথা আরকানী ভিক্ষুদের উচ্চারণের ভারতীয় পালি ভাষার উচ্চারণ বিকৃতভাবে শিখিয়া ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরকান প্রদেশের সংঘরাজ এবং এখানকার থেরবাদ প্রতিষ্ঠাতা বিনয়ধর

সারমেধ মহাস্থবিরের অন্যতম শিষ্য এবং এখানকার অন্ধকার বৌদ্ধ যুগের সমাজ সংস্করের অগ্রদূত সদ্ধর্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান ভিক্ষু চন্দ্রমোহন সিংহল হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আচার্য্য পূর্ণাচার মহাস্থবির নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহার গুরুদেব সারমেধ মহাস্থবিরের সম্মতিক্রমে তিনি গৌরবময় শ্রদ্ধার আসনে অর্থাৎ সংঘরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এখানকার বিকৃত পালি উচ্চারণ অনেকটা পরিবর্তিত হইয়াছে। তবুও পালি ব্যাকরণ গভীরভাবে আলোচনা পূর্বক বিশুদ্ধ পালি ভাষার উচ্চারণ করার দিকে দৃষ্টিপাত করা একান্ত কর্তব্য। কচ্চায়ন ব্যাকরণই পালি ভাষার একমাত্র সর্বপ্রথম প্রাচীনতম ব্যাকরণ। এই কচ্চায়ণ ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় বেদ-বেদাঙ্গ শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিত এবং চারি প্রতিসম্ভিদা সম্পন্ন আরহত ভিক্ষু।

'অ'-কারান্ত শব্দকে 'আ'-কারান্ত উচ্চারণ করা, অন্তস্থ 'য' কে 'এয়া' উচ্চারণ করা এবং সর্ব স্থানে 'ব'ক 'ওয়া' উচ্চারণ করা পালি ভাষার মূল ব্যাকরণ আলোচনায় কোথায়ও পরিদৃষ্ট হয় না। ব্যাকরণ আলোচনায় জানা যায় ঃ-

(ক) ১। অন্তস্থ 'য' শব্দের প্রথমে থাকিলে সব সময়ে অন্তস্থ 'য' উচ্চারিত হয়'-যম, যমুনা, যোগ, যান, যতি, যক্খ, যাচতি ইত্যাদি।

২। অন্তস্থ 'য' শব্দের শেষে থাকিলে সব সময়ে 'য়' (অন্তস্থ-অয়) উচ্চারিত হয়; যথা ঃ- গয়া, দয়া, বিনয়, ভয়, সময়, নিরয় ইত্যাদি; কিন্ত বিকল্পে সরযূ।

৩। অনু, সু, সং, উপ, অতি উপসর্গের পর এবং 'অ'-যোগে বিপরীতার্থক শব্দের পর, সমাসের শেষের শব্দের আদ্যক্ষর, উপসর্গের পর ক্রিয়া বিভক্তি ও কৃত প্রত্যয়ান্ত ধাতুর আদ্যক্ষর অন্তস্থ 'য' হয়; যথা ঃ- অনুযোগ, সুযোগ, সংযোজন, উপযোগ,

অভিমান, অযোগবাহ, মহাযান, আকাসযান, বি+✓যুজ্+তি=বিযুক্তি, প+✓যুজ্+ত=পযুক্ত ইত্যাদি।

কিন্তু যোগ শব্দের পুর্বে 'প', 'বি', 'নি'

উপসর্গ থাকিলে 'য়' (অন্তস্থ-অয়) হয়; যথা ঃ-

প+যোগ=পয়োগ, বি+যোগ=বিয়োগ, নি+যোগ=নিয়োগ।

৪। এতদ্ভিন্ন শব্দের মধ্যে অন্তস্থ 'য' থাকিলে 'য' (অন্তস্থ-অয়) হয়; ময়ুর, নয়ন, চয়ন, সয়ন, নায়ক, দায়ক ইত্যাদি। কিন্তু বিকল্পে- অযোজ্ঝা, পিযুস।

দ্রষ্টব্য ঃ- 'য়' (অন্তস্থ-অয়) পালি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অন্তস্থ-'য' এরই রূপান্তর মাত্র। ইহা স্বতন্ত্র অক্ষর নহে। এই অক্ষরটি পালি ও সংস্কৃত ভাষায় বাংলা ভাষার অক্ষরে লিখিবার সময় শব্দের মধ্যে বা শেষে যেখানে অন্তস্থ-'য' উচ্চারিত হয় না, সেখানে অন্তস্থ-'য' এ একটি বিন্দু দিয়া উচ্চারণের সুবিধার জন্য এইরূপ 'য' (অন্তস্থ-অয়) প্রয়োগ করিয়া থাকে।

(খ) পালি ভাষায় অন্তস্থ-'ব" কে 'ওয়া' উচ্চারণের বিধান আছে বটে; যথাঃ- কত্বা (করিয়া), গন্ত্বান (গিয়া), দ্বে (দুই) ইত্যাদি। কিন্ত সর্ব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। বর্গীয়-'ব' এর এর উচ্চারণ কোন ক্ষেত্রে 'ওয়া উচচারণের বিধান নাই। বর্গীয়-'ব' কে সর্বক্ষেত্রে 'ব' উচ্চারণ করিতে হয়; যথাঃ ব্রহ্মা, ব্যাকরণ, বুদধ, নিবাবন, ব্রাহমন, অম্ব, ইত্যাদি বাংলা ভাষার অক্ষরে বর্গীয়-'ব' ও অন্তস্থ-'ব' লিখিবার চিহ্ন এক সদৃশ বা অভিন্ন। এই দুটি 'ব' এর পরিচিহ্ন ব্যাকরণের বিধান আলোচনায় জানিতে হয়।

সাধারণতঃ যেই 'ব' সন্ধিতে জাত, সন্ধি বিচ্ছেদ জাত, ধাতুজাত, প্রত্যয় জাত, নিপাত জাত, 'প'-বর্গ ভিন্ন অন্য সমস্ত ফলা জাত-'ব',

সেই সকল 'ব' অন্তস্থ-'ব';

আর যেই সকল 'ব' 'প'-বর্গ জাত, 'য'=য-ফলা জাত, সংযুক্ত 'ব', '্র'=র -ফলা জাত, সেই সকল 'ব' বর্গীয়-'ব'; যথা ঃ-

অন্তস্থ 'ব'

১। সন্ধিতে জাত ঃ- মনু+ অন্তর=মন্বন্তর, অনু+এসন=অন্বেসন।
২। সন্ধি বিচ্ছেদে জাত ঃ- নি+বান=নিবাবন, প+বজ্জং=পব্বজ্জং।
৩। ধাতু জাত ঃ- ✓বস্ +তি=বসতি, ✓বদ্+তি =বদতি।
কিন্তু বিকল্পে ধাতু জাত বর্গীয় 'ব' ঃ- ✓বুধ্+তি =বুজ্ঝতি,
✓বুধ্+ত=বুদ্ধ, ✓বন্ধ্+তি=বন্ধতি।
৪। প্রত্যয় জাত ঃ- ✓হস্+ত্বা=হসিত্বা, ✓কর্+ত্বান=কত্বান।
৫। উপসর্গ জাত ঃ- অব + ইচ্চ=অবেচ্চ, বি+ ✓রম্+তি=বিরতি।
৬। নিপাত জাত ঃ- বে, বত, বা, এবং।
৭। - প বর্গ ভিন্ন অন্য সমস্ত ফলা জাত 'ব' ঃ- দ্বার, দ্বে, দ্বিগু।
দ্রষ্টব্য ঃ- দুইটি অন্তস্থ-'ব' সংযুক্ত বর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু 'ব' সংযুক্ত বর্ণরূপে ব্যবহৃত হইলেই বর্গীয়-'ব' নামে পরিচিত হয়।

বর্গীয় 'ব'

১। প=বর্গ জাত ঃ- সম্বোধি, আরম্ভ, অম্ব, জম্বু, তম্ব।
২। ্য = 'য' জাত ঃ- ব্যাধি, ব্যাকরণ ব্যঞ্জন, ব্যগ্ম্র।
৩। সংযুক্ত 'ব' = নিব্বান, পব্বজ্জং, সব্ব, পুবাব, সব্বদা।
৪।্র ='ব' ফলা জাত ঃ- ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ, ✓ব্রু (বলা) +তি=ব্রুতি।
(গ) আর ব্যাকরণে 'অ' - কারকে 'আ'-কার উচ্চারণের বিধানও সংস্কৃত, বাংলা, আসামী, উড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি ভারতীয় প্রাকৃত

ভাষা হইতে সমুদ্ভুত ভাষা সমূহেও পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু প্রাকৃত হইতে সমুদ্ভুত পালি ভাষা 'অ'-কারকে 'আ'-কার উচ্চারণের প্রয়োজন হইলে পালি ভাষায় লিখিবার জন্য তাদৃশ পৃথক অক্ষরেরও কোন প্রভাব ছিল না। আর পালি ভাষায় সন্ধি ভিন্ন পালি ব্যাকরণের বিভক্তির বিধান অনুযায়ী সব সময়ে পালি ভাষার পদান্তে বিভক্তির চিহ্ন 'ং' (অনুস্বার) ব্যবহৃত হয়। কখনও পালি ভাষায় সন্ধি ভিন্ন পদান্তে 'ম্' (হসন্ত যুক্ত ম) ব্যবহৃত হয় না; যথা ঃ- বন্দে তিরতনং, জয়তু বুদ্ধ-সাসনং, বন্দে মাতরং ইত্যাদি। কিন্ত সংস্কৃত ব্যাকণের বিভক্তির বিধান অনুযায়ী সংস্কৃত ভাষায় অদান্তে হসন্তযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ ব্যবহৃত হয়; যথা ঃ- বন্দে ত্রিরত্নম্, জয়তু বুদ্ধ-শাসনম, বন্দে মাতরম্ ইত্যাদি।

পালি-সংস্কৃত-বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও তুলনামূলক পালি উচ্চারণের কারণ প্রদর্শন ঃ

প্রাচীন যুগের বৈদিক ভাষা আর্য জাতির ভাষার প্রভাবে ও যুগের তাগিদে পড়িয়া আর্য ও অনার্য জাতির সংমিশ্রিত পরিবর্তিত ভাষাই হইল প্রাকৃত ভাষা। ইহাই প্রকৃত জনসাধারণের মাতৃভাষা বলিয়া প্রাকৃত নামকরণ করা হইয়াছে; বর্তমানে আমাদের দেশে বাংলা ভাষার মাতৃভাষা যেমন বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রূপ পরিবর্তন দৃষ্ট হয়, তেমন তখনকার দিনেও প্রাকৃত ভাষা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ পরিবর্তন দৃষ্ট হয়; যথা ঃ- মাগধী প্রাকৃত, শৌরসেনী প্রাকৃত, মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ইত্যাদি। কিন্তু প্রাকৃত ভাষা সমূহের মধ্যে মাগবী প্রাকৃতের গুরুত্ব সর্বাধিক। ভগবান গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী হইতে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর দিকে প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হয়। বৈদিক ভাষাকে বিকৃত ভাষার প্রভাবমুক্ত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রথিত যশা তর্কবাগীশ বৈয়াকরণ পানি-নি সর্বপ্রথম ব্যাকরণ

রচনা করিয়া প্রাকৃত ভাষার সংস্কার সাধন করেন। এইভাবে ভাষার সংস্কার সাধন হইতে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব হয়। ভারতীয় লিপির ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বর্ণমালার বিবর্তনে মাগধী ভাষার ব্রাহ্মী অক্ষর হইতে সংস্কৃত ভাষার দেবনাগরী অক্ষর উদ্ভুত হয়। এই সংস্কৃত ভাষায়ও তাদৃশ পূর্বোক্ত উচ্চারণ পরিদৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে বাঙ্গালী বৌদ্ধ বাহুলগণ কর্তৃক রচিত সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের আদি কবিতা বৌদ্ধ চর্যাপদ। ইহার পূর্বে বাংলা ভাষায় অন্য কোন বই পরিদৃষ্ট হয় না।

তদ্বেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামান ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের স্মরণিকা পত্রিকায় 'বাংলা সাহিত্য ও বৌদ্ধ প্রভাব' নামক তাঁহার স্বরচিত প্রবন্ধে বলেন,-"বৌদ্ধ চর্যাপদ ও দোঁহার মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় মেলে। বৌদ্ধ চর্যাপদ মুসলিম বিজয়ের আগে বাংলা সাহিত্যের চর্চা শুধু বৌদ্ধেরাই করেছিলেন এবং সে-চর্চা ক্ষণিকের ব্যাপারে নয়, কয়েক শতাব্দীর সাধনা ফল।" অধিকন্ত প্রথিত যশা বাংলাভাষাবিদ্ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ বাংলা ভাষা অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বলেন,-মাগধী প্রাকৃত ও মাগধী অপভ্রংশ হইতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল দশম শতাব্দীতে। মাগধী প্রাকৃত ও মাগধী অপভ্রংশ পালি ভাষারই রূপান্তর মাত্র। এই পালি ভাষার উৎপত্তিকাল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। আবার মাগধী ভাষাকে পালিভাষাও বলা হয়। এই পালি ভাষার ব্রাহ্মী অক্ষর হইতে বাংলা ভাষার অক্ষর উদ্ভব হয়। বাংলা ভাষায়ও তদনুরূপ পূর্বোক্ত উচ্চারণ পরিদৃষ্ট হয় না; কেননা পালি ভাষার ন্যায় সংস্কৃত ভাষাও বাংলা ভাষা ভারতের বাহিরে প্রচারিত হইয়া তৎদেশীয় ভাষার উচ্চারণের অনুকরণে বিকৃত উচ্চারণ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে নাই।

পালি ভাষার আলোচনা ও গবেষণা ঃ

বৌদ্ধ পাল সাম্রাজ্যের পতনের পর সেনরাজবংশের অভ্যুত্থান হয় এবং দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে একদিকে বিদেশী রাজার আক্রমণ, আর অন্যদিকে জাতিভেদ প্রথা, কৌলিন্যের দাপট, উচুনীচু ভেদাভেদ, নরহত্যা, লুণ্ঠিত প্রভৃতি জঘন্য কার্যকলাপের এবং কামানের গোলাগুলি বর্ষণে মগধের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিক্রমশীল বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাবের তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লার ময়নামতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সমস্ত বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেই সময়ে প্রাণভয়ে ভারতীয় বৌদ্ধেরা দলে দলে ধর্মান্তরিত হইয়া যায়। তথাকার বহু সংখ্যক ধর্মভীরু একনিষ্ঠ বৌদ্ধ সর্বহারা হইয়া স্বধর্ম রক্ষার্থে পাহাড়ী অঞ্চলের পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এতদঞ্চলে আরকান বৌদ্ধ রাজার প্রভাব দর্শনে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় নিৎসহায় অবস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এতাদৃশ কারণে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজ তথা ভারত হইতে ভারতীয় পালি ভাষা অন্তহিত হইয়া যায় এবং আরকানের জনসাধারণের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল সংমিশ্রণের ফলে তাহাদের আচার-ব্যবহার ও কার্যকলাপ ইত্যাদি বহুলাংশে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজ বিপুল প্রভাব বিস্তার করে।

পালি উচ্চারণ বিকৃত হওয়ার কারণ এবং বিকৃত পালি উচ্চারণ বর্জনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

এরূপভাবে কয়েক শতাব্দী আরকান বৌদ্ধ জনসাধারণের সঙ্গে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজে পূর্ব সংমিশ্রণের প্রভাব প্রতিপত্তি স্মৃতি পথে বিদ্যমান থাকার ফলে এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের তদানীন্তন চন্দ্র মোহন ভিক্ষু মহোদয়ের আহ্বানে আরকানের প্রাদেশিক সংঘরাজ পণ্ডিত প্রবর বিনয়ধর সারমেধ মহাস্থবিরের প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম এতৎ দেশে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সহজতর হইয়াছে। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ রাজত্বকালে আমাদের

শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এতৎদেশে বিনয়ধর্ম শিক্ষার জন্য সদ্ধর্মের কোন পালি প্রতিষ্ঠান না থাকায় আরকান তথা ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ও মেলামিশার পূর্বস্মৃতি এবং যাতায়াতের সুবিধার দরুণ কোন কোন বিদ্যোৎসাহী তরুণ বৌদ্ধভিক্ষু বিলুপ্ত বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কার সাধনে পুনরুদ্ধারের জন্য ব্রহ্ম ভাষার উচ্চারণের অনুকরণে পালি ভাষার পূর্বোক্ত বিকৃত উচ্চারণ ও বিনয়-ধর্ম শিক্ষা করিয়া পুনরায় বাংলাদেশে প্রচার করেন। তদ্ধেতু বর্হিভারতের ভাষার অনুকরণে বর্তমানে তদনুরূপ ভারতীয় পালি ভাষা উচ্চারণ করা কোন মতেই সমীচীন নহে। এতাদৃশ কারণে পালি ভাষার পূর্বোক্ত বিকৃত উচ্চারণ ব্যাকরণের সংবিধান বিহীন এবং যুক্তিবিহীন ও বিবেক বহির্ভূত। তাই তৎকালীন প্রাকৃত ভাষা হইতে সমুদ্ভূত-ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ এবং পালি ভাষার পরবর্তী কালীন প্রাকৃত ভাষা হইতে সমুদ্ভূত ভারতীয় বাংলা ভাষার ব্যাকরণের সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা হইতে সমুদ্ভূত-সমস্ত ভারতীয় ভাষার ঐক্য অক্ষর সমূহের উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রাকৃত ভাষা হইতে সমুদ্ভূত-ভারতীয় পালি ভাষার পূর্বোক্ত বিকৃত উচ্চারণ সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

উপসংহার ঃ

উপসংহারে ইহাও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে পৃথিবীতে যত একই প্রকার লেখ্য ভাষার উদ্ভব হইয়াছে, তৎসমুদয় ভাষায় কোথায়ও দুই প্রকার উচ্চারণ পরিদৃষ্ট হয় না। একমাত্র সরকার অনুমোদিত নিম্ন উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত, বাংলা ইত্যাদি ভারতীয় ভাষার ন্যায় ভারতীয় পালি ভাষার মূল-ব্যাকরণের সংবিধান অনুযায়ী এক প্রকার পালি ভাষার উচ্চারণ এবং ভিক্ষু সমাজে ব্রহ্ম ভাষার উচ্চারণের অনুকরণে ভিন্ন প্রকার পালি ভাষার উচ্চারণ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু বিভিন্ন ভাষা

ভাষী সুখী সমাজের জিজ্ঞাসাবাদে পালি ভাষায় একই অক্ষর দুই প্রকার উচ্চারণের কারণ প্রদর্শনের জন্য কোন যুক্তি সঙ্গত সদুত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তজ্জন্য ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা হইতে সমুদ্ভূত ভাষা সমূহের উচ্চারণের সমতা সংরক্ষণ করিয়া 'সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয় সমূহে পালি ভাষার উচ্চারণের ন্যায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রত্যেকেরই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং ভারতীয় প্রাকৃত-ভাষা হইতে সমুদ্ভূত-সমস্ত ভারতীয় ভাষার উচ্চারণ একক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভাষাবিদ্ বিশেষজ্ঞ সুধীমণ্ডলীরই বিবেক সঙ্গত যুক্তি। কেননা ইহা উপেক্ষা করার জন্য ভাষার যুক্তি সঙ্গত কোন বৈয়াকরণিক সংবিধান উদ্ভাবন করা যায় না।

বর্তমানে বাংলাদেশের পালি টোল সমূহে সিংহল ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রধান দেশের ন্যায় বিনয়-ধর্ম শিক্ষার মান-উন্নয়ণের লক্ষণ কিছুই পরিদৃষ্ট হইতেছে না। তদ্ধেতু এতৎ দেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মীয় পালি শিক্ষা প্রদানের জন্য উপযুক্ত অভিজ্ঞ পালি শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া বৌদ্ধ সমাজের হিতার্থে বোর্ড পরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয় সমূহের ন্যায় পূর্ববৎ বিহার কেন্দ্রিক উচ্চাঙ্গ পর্যায়ের 'আবাসিক আদর্শ পালি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত বৌদ্ধ গ্রাম সমূহে চাহিদা অনুযায়ী স্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। পালি ভাষার ব্যাকরণের সংবিধানাবলী সম্বন্ধে সুষ্ঠ ভাবে জ্ঞানলাভ না করিলে পালি ভাষার প্রকৃত উচ্চারণ ও ব্যুৎপত্তিগত শব্দার্থ উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। তজ্জন্য প্রকৃত জ্ঞানলাভও হয় না। এতাদৃশ পালি প্রতিষ্ঠানে সরকারী অনুমোদন লাভে সন্তোষজনক সরকারী সাহায্যে প্রদানের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও কর্তব্য। এরূপ গঠনমূলক আদর্শ পালি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভিক্ষুগণ ও বিদ্যোৎসাহী গৃহীবৃন্দ বিনয় ধর্মে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারিলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

ভারতীয় আদিলিপি আবিষ্কার ঃ

'ললিদ বিস্তর' নামক বুদ্ধ চরিত্র গ্রন্থে ৬৪ প্রকার লিপির নামে সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম দুইটি লিপি ব্রাহ্মী ও খরোষঠী। ভারতীয় লিপির ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পাকিস্তানের প্রাচীনতম বর্ণমালা খরোষ্ঠী। এই লিপি ডানদিক থেকে বামদিকে লিখিত। এই লিপি পাক-ভারতের বাহিরে মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত ছিল। এই লিপির থেকে অন্য কোন লিপি উদ্ভব হয় নাই।

কুলার সাহেব বলেন, ব্রাহ্মী লিপি প্রথমে ডানদিক থেকে বামদিকে লিখা হইত, পরে বামদিক থেকে ডানদিকে লেখার প্রথা প্রবর্তিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ইতিহাসেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। অনেকের মতে ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়াই এই লিপির নাম ব্রহ্মী। পাকিস্তানের 'শাহবাজগঢ়হি' ও 'মানসেরা'য় মহারাজ অশোকের দুইটি অনুশাসন লিপিতে খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। এই দুইটি অনুশাসন লিপি ব্যতীত সম্রাট অশোকের অন্যান্য সমগ্র অনুশাসন লিপিই ব্রাহ্মী বণ্যমালায় লিখিত। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময়কালে পাক-ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশ ব্যতীত সর্বত্র ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন ছিল।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ এই ব্রাহ্মীলিপিকে পালিলিপি বা ভারতীয় পালিলিপি নামে অভিহিত করিয়াছেন। আবার সম্রাট অশোক কর্তৃক শিলাস্তম্ভে, পর্বতগাত্রে এবং তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গতিতে ত্রিপিটক শাস্ত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মী অক্ষরে লিপিবদ্ধ করায় এই লিপি অশোক

লিপি নামেও পরিচিত। বর্তমানে পাক-ভারতে প্রচলিত প্রায় সব লিপিই ব্রাহ্মী বর্ণমালা থেকে উদ্ভুত। শুধু তাহাই নহে, পাক-ভারতের বাহিরের কয়েকটি লিপিও এই বর্ণমালা হইতে জন্ম নিয়াছে, যেমন ঃ- সিংহলী, বর্মী, যবদ্বীপী, তিব্বতী।

প্রাচ্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ জেনারেল কানিংহামের মতানুসারে ব্রাহ্মীলিপি পাকভারতেই উদ্ভুত, বিদেশ অকে গৃহীত হয় নাই। তিনি এই যুক্তির সমর্থনে বিভিন্ন বর্ণের সঙ্গে কোন না কোন বস্তুর আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন–পাণি-নির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে লিপি, বর্ণ অক্ষর প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, পাণি-নির সময়কালে লিপির প্রচলন ছিল। পাণি-নির সময়কাল খৃষ্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতাব্দী। অশোকের অনুশাসন লিপিতে ব্রাহ্মী অক্ষরের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা সুগঠিত ও সুপরিণত। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময়কালে প্রায় সমগ্র পাক-ভারতে, ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন ছিল। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক হইতে প্রথম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত এই লিপি অপরিবর্তিতই ছিল। লিপির ইতিহাস এবং বর্ণমালার বিবর্তনের ধারা স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, বাংলা এবং দেবনাগরী লিপিও ব্রাহ্মী লিপি হইতে উদ্ভূত। তদ্ধেতু ব্রাহ্মী লিপি হইতে উদ্ভূত যে কোন ভাষার অক্ষরে এই পালি ভাষা লিপিবদ্ধ করা যায়।

সুতরাং ব্রাহ্মী লিপি হইতে উদ্ভূত ভারতে ও ভারতের বাহিরে বিভিন্ন ভাষায় সমগ্র অক্ষরগুলির নাম অভিনব ও অপরিবর্তনশীল; কিন্তু ব্রাহ্মীলিপি হইতে উদ্ভুত বিভিন্ন অক্ষরগুলির আকৃতি বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তনশীল পরিদৃষ্ট হয়। পালি ভাষার সর্বদিক বৈশিষ্ট্য বজায়

রাখিবার জন্য ভগবান বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য গভীর জ্ঞান সম্পন্ন স্মৃতি বা 'কচ্চায়ন মহাথের' কর্তৃক সর্বপ্রথম পালি ভাষার ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। ইহাতেই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির উচ্চারণ বা ভারতীয় পালি ভাষার উচ্চারণ বহির দেশীয় মাতৃভাষার অনুকরণে উচ্চারিত হওয়া কোন কারণেই যুক্তি সঙ্গত নহে। সুতরাং বাংলাদেশ ও ভারত রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত ভারতীয় ব্রাহ্মী ভাষা হইতে উদ্ভুত বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণের ন্যায় পালি ভাষার উচ্চারণও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য ভাষা তত্ত্ববিদ্ সুধীমণ্ডলীর অভিমত। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বজাতির শিক্ষার মাপকাঠি।

মাগধী প্রাকৃত হইতে বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি ঃ

ভাষাতত্ত্ব আলোচনার মাধ্যমে মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন ভারতীয় ভাষা সমূহের উচ্চারণের সঙ্গে পালি ভাষার উচ্চারণের যুক্তি প্রদর্শন ও সমতা সংরক্ষণের জন্য পর্যায়ক্রমে ভাষা সমূহের সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম ও ব্যাকরণের উৎপত্তিকাল নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বৈদিক ভাষা ঃ

বৈদিক (বেদ+ষ্ণিক) ভাষা ভারতের প্রাচীনতম আর্য (ঋষি+ষ্ণ) জাতি বা ঋষিদের ভাষা। বেদ যেই ভাষায় লিখিত হইয়াছে, তাহাই বৈদিক ভাষা। ভাষা আলোচনায় জানা যায়, বৈদিক ভাষার স্থিতির জন্য বৈদিক ভাষার ব্যাকরণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব পনরতম শতাব্দী হইতে ভারতে আর্য জাতির বসবাস।

বৈদিক ভাষা হইতে প্রকৃত ভাষা ঃ

প্রাকৃত (প্রকৃত+ষ্ণ) ভাষা আর্য ও অনার্য জাতির সংমিশ্রিত প্রকৃত জনসাধারণের জন্য। প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তিকাল খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী হইতে খৃষ্টপূর্ব শতাব্দীতে। অনার্য বলিতে দ্রাবিড় ও কোনজাতিকে বুঝায়।

বর্তমানে পালি ও সংস্কৃত ব্যাকরণের ন্যায় তুলনামূলক প্রাকৃত ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষা প্রধানতঃ তিন প্রকার; যথা ঃ- মাগধী প্রাকৃত, শৌরসেনী প্রাকৃত ও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত।

মাগধী প্রাকৃত ঃ

মাগধী (মগধ+ঈ) প্রাকৃত মগধ সাম্রাজ্যের ভাষা বাংলাদেশের গৌড় প্রাকৃত সমূহের মধ্যে মাগধী প্রাকৃতির গুরুত্ব সর্বাধিক। কেননা তখনকার দিনে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র শিক্ষাদীকার প্রধান কেন্দ্র স্থান ছিল এবং মগবী ভাষা ভারতে বহুল প্রচারিত সর্বসাধারণের জনপ্রিয় বোধগম্য ভাষা বলিয়া ভগবান বুদ্ধও এই ভাষায় তাঁহার নবাবিস্কৃত বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে কোন মহাপুরুষের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য প্রতিভা দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় নাই। তজ্জন্য অন্যান্য প্রাকৃত ভাষা বর্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে।

সৌরসেনী (শূরসেন+ ঈ) প্রাকৃতঃ

ইহা শূরসেন অঞ্চলের ভাষা। শূরসেন সংযুক্ত প্রদেশে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত।

মাহারাষ্ট্রী (মহারাষ্ট্র+ঈ) প্রাকৃতঃ

ইহা মহারাষ্ট্র অঞ্চলের ভাষা। মহারাষ্ট্র দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন প্রদেশ।

সংস্কৃত (সম্+ ✓কৃ+ত)ঃ

বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার পার্থক্য যথেষ্ট। বৈদিক ভাষার উৎপত্তি কাল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব পনরতম শতাব্দীতে। বৈদিক ভাষা আর্যদের মাতৃভাষা। সংস্কৃত ভাষা কোন দেশের মাতৃভাষা নহে। এই ভাষা বৈদিক ভাষা হইতে পরিমার্জিত এবং মাগধী প্রাকৃত ভাষা হইতে সংস্কার জাত বলিয়া সংস্কৃত নামে অভিহিত হইয়াছে। এই ভাষার

স্থিতির জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পাণিনি কর্তৃক সর্বপ্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচিত হয়। ইহাই পাণিনি ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ।

পালি (পাল্+ই)ঃ

পালি ভাষায় উৎপত্তিকাল সংস্কৃত ভাষার পরে খৃষ্টপুর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। ইহা মগধ সাম্রাজ্যের পল্লী অঞ্চল সমূহের পরিমার্জিত ভাষা। পল্লী শব্দ হইতে পালি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত। সংস্কৃত ভাষায় বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং উপসম্পদা প্রাপ্ত চারি প্রতিসম্ভিদা সম্পন্ন অরহত কচ্চায়ণ মহাস্থবির কর্তৃক সংস্কৃত ব্যাকরণের পরে সর্বপ্রথম পালি ভাষার ব্যাকরণ রচিত হয়। ইহাই কচ্চায়ন ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ।

বাঙ্গালা (বঙ্গ+আল+আ)ঃ

মাগধী প্রাকৃত হইতে পালি ভাষার পরে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তিকাল দশম শতাব্দীতে। ইহা ভাষাবিদ সুধীমণ্ডলীরই অভিমত। আসামী, উড়িয়া, হিন্দি, মেখিলী ইত্যাদি ভাষাও মাগধী প্রাকৃতেরই বিবর্তিত রূপ। ভাষা সমূহের স্থিতির জন্য এই সকল ভাষার ব্যাকরণও প্রথমে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের অনুকরণে রচিত হইয়াছে। সুতরাং এখন সর্বশেষ বক্তব্য এই,–ভাষাও মানব জাতির ন্যায় প্রাচীন। ভাষা আদিতে উপ-ভাষা বা মাতৃভাষার আকারে ছিল। পরবর্তীকালে মানবজাতির জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে উপভাষা ভাষার স্থান দখল করে। ভাষা নিত্য পরিবর্তনশীল। মাগবী ভাষাই পালি ভাষার ভিত্তি। এই পালি ভাষাই ছিল বিশাল মগধ সাম্রাজ্যের উপভাষা। জনসাধারণের বুঝিবার সুবিধার জন্য এই উপভাষায় গৌতম বুদ্ধ তাঁহার নবাবিস্কৃত বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। সংস্কৃত-পালি-বাংলা ভাষার মধ্যে যতই পার্থক্য দৃষ্ট হউক না কেন – প্রত্যেকটি ভাষা

ভারতীয় প্রাকৃত আর্য ভাষার অন্তর্গত। ইহাদের উৎপত্তির উৎসও এক। তজ্জন্য ইহাদের উচ্চারণও হইবে অভিন্ন। পালি ভাষা সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা ভারতীয় প্রাকৃত আর্য ভাষার অন্তর্গত। ইহাদের উৎপত্তির উৎসও এক। তজ্জন্য ইহাদের উচ্চারণও হইবে অভিন্ন। পালি ভাষা সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার মিশ্র লক্ষণ বিশিষ্ট। মাগধী প্রাকৃত তথা পালি ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা ও বাংলা ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশা কিরূপ, তাহা উপলব্ধি ও উচ্চারণের সুবিধার জন্য কয়েকটি উদাহরণ অপর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল, যথা ঃ-

সম্পূর্ণ সদৃশ ঃ

সংস্কৃত	পালি	বাংলা
পিতা–	পিতা–	পিতা–
মাতা–	মাতা–	মাতা–
রাজা–	রাজা–	রাজা–
নখ–	নখ–	নখ–
চোর–	চোর–	চোর–
দেবতা–	দেবতা–	দেবতা–
পাপ–	পাপ–	পাপ–
মেঘ–	মেঘ–	মেঘ–
ব্যাকরণ–	ব্যাকরণ–	ব্যাকরণ–
সুখ–	সুখ–	সুখ–
ফল–	ফল–	ফল–
পূজা–	পূজা–	পূজা–
লোভ–	লোভ–	লোভ–
যম–	যম–	যম–
মাস–	মাস–	মাস–
হিংসা–	হিংসা–	হিংসা–
লতা–	লতা–	লতা–

সাধারণ অসদৃশ ঃ

সংস্কৃত	পালি	বাংলা
কর্ম্ম	কম্ম–	কাম–
কর্ন–	কন্ন–	কান–
সর্প–	সপ্প–	সাপ–
পত্র–	পত্ত–	পাতা–
ছত্র–	ছত্ত–	ছাতা–
চন্দ্র–	চন্দ–	চাঁদ–
হস্তী–	হত্থী–	হাতী–
ভ্রাতা–	ভাতা–	ভাই–
আম্র–	অম্ব–	আম–
তাম্র–	তম্ব–	তামা–
অদ্য–	অজ্জ–	আজ–
মনুষ্য–	মনুস্স–	মানুষ–
চক্ষু–	চক্খু–	চোখ–
ব্যাঘ্র–	ব্যগ্‌ঘ–	বাঘ–
বৎসর–	বচ্ছর–	বছর–
পুত্র–	পুত্ত–	পুত–
মৎস্য–	মচ্ছ–	মাছ–

সম্পূর্ণ অসদৃশ ঃ

সংস্কৃত	পালি	বাংলা
স্বর্ণ–	জাতরূপ–	সোনা–
রৌপ্য–	রজত–	রূপা–
বৃক্ষ–	রুক্খ–	গাছ–
শ্বেত–	ওদাত–	সাদা–
হীরক–	বজির–	হীরা–
শ্বশ্রূ–	সস্‌সু–	শাশুরী–
শ্মশ্রু–	মস্‌সু–	দাড়ি–
ক্ষৌরিক–	কপ্পক–	নাপিত–
দস্যু–	মহাচোর–	ডাকাত–
কাষ্ঠ–	দারু–	কাঠ–
নাসিকা–	ঘাণ–	নাক–
স্নায়ু–	নহারু–	শিরা–
বংশ–	বেলু–	বাঁশ–
উদ্যান–	উয়্যান–	বাগান–
কদলী–	রম্ভা–	কলা–
চিকিৎসক–	বেজ্জ–	বৈদ্য–
ত্বক–	তচ–	চামড়া–

জাতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ

ইহাও সর্বশেষ পর্যায়ে আলোচনা করা আবশ্যক যে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান,–তাহাদের স্বজাতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকার ফলে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়ার কোন আবশ্যক হয় না। কিন্তু বাঙ্গালী বৌদ্ধদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিচয় না দিলে বাঙ্গালী বৌদ্ধদিগকে অপরিচিত লোকেরা হিন্দু জাতি বলিয়া মনে করে। ইহার একমাত্র কারণ, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাষ্ট্র বিপ্লবের সর্ববিধ স্বজাতীয় বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং বর্তমানে শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাতির ন্যায় বৌদ্ধ জাতিরও বৌদ্ধ ধর্মানুসারে প্রত্যেকে স্বজাতীয় বৈশিষ্ট্য-গুলি পুনরায় সম্যকভাবে আচরণ করা এবং সমাজে পুনঃ প্রবর্তন করা অত্যাবশ্যক। এতাদৃশ আচারণের ফলে বৌদ্ধ জাতির পূর্ব লুপ্ত গৌরব আবার পৃথিবীর বুকে গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। তদ্ধেতু বৌদ্ধদের শেখিয়া ধর্ম আচরণের মাধ্যমে আহারে-বিহারে, গমনে-শয়নে, আলাপে-পোষাকে, আচারে-ব্যবহারে ও ধর্মে-কর্মে সর্বত্রই প্রত্যেকের জীবন যাত্রায় বৌদ্ধোচিত ভাবধারা বিকশিত হওয়া নিত্যন্ত প্রয়োজন। তজ্জন্য বৌদ্ধ জাতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি সম্যকভাবে আচরণ করিবার মানসে সর্ব সাধারণের জ্ঞাপনার্থে 'বৌদ্ধ পরিচিতি' নিম্নে প্রদর্শিত হইল ঃ-

১। বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের ত্রিচীবরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে যে কোন বৌদ্ধ ধর্মীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে, পঞ্চশীল প্রার্থনা করিবার সময়ে, ত্রিরত্নের উপাসনাকালে, বুদ্ধ প্রতিমূর্তি ও ভিক্ষু বা ভিক্ষুসংঘের বন্দনাকালে অনাবৃত মস্তকে চাদর বা গায়ের কাপড় ভিক্ষুদের ব্যবহৃত উত্তরাসঙ্গের ন্যায় বামদিকে 'একাংশ' করিয়া প্রত্যেক ব্যবহার করিতে

হয়। ইহারই বৌদ্ধ জাতির লক্ষণ।

[দ্রষ্টব্য ঃ –**একাংশ** ঃ– একখানা চাদর বা গায়ের কাপড়ের এক অংশ বাম স্কন্ধে সামনের দিকে ঝুলাইয়া দিয়া চাদর বা গায়ের কাপড়ের অপর অংশ বাম স্কন্ধের উপর দিয়া ডান বগলের তলদেশ দিয়া আবার বাম স্কন্ধের উপর দিয়া পিছনের দিকে সুন্দরভাবে ঝুলাইয়া দিতে হয়। ইহাকে পালি ভাষায় বলা হয় 'একাংশ' ইহার মূল উদ্দেশ্য হইল, বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উত্তরাসঙ্গের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। 'একাংশ শব্দের অর্থ বাম স্কন্ধের উপর স্থাপন করা। ভিক্ষুদের শরীরে সব সময়ে বামদিকে 'একাংশ' করিয়া ব্যবহার করার চীবরকে বলা হয় উত্তরাসঙ্গ। ডানহাত এই উত্তরা সঙ্গের বাহিরে রাখিয়া আশীর্বাদ, নমস্কার ও কাজ কর্মের সুবিধার জন্য ভগবান বুদ্ধ উত্তরাসঙ্গ এরূপভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।]

২। শ্রাবস্তীবাসী জনৈক শ্রেষ্ঠী কন্যার স্বামী ভগবান বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রী, স্বামীহীনা বলিয়া কোশলরাজ প্রসেনজিত তাঁহার অন্তঃপুরে লইয়া আসেন। একদিন রাজা প্রত্যেককে একটি করিয়া নীলোৎপল (নীল বর্ণের পদ্মফুল) দিয়া স্বামী বিহীনা স্ত্রীলোকটিকে দুইটি নীলোৎপল দিয়া ছিলেন। সেই স্ত্রীলোক সেই পদ্মফুল পাইয়া প্রথমে আনন্দিত হইলেন এবং পরে ফুলের ঘ্রাণ লইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। উৎফুল্লতা ও ক্রন্দনের কারণ রাজা জিজ্ঞাসাবাদে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্বামীর মুখের সুগন্ধি নীলোৎপলের সুগন্ধির ন্যায় ছিল। রাজা একদিন সেই ভিক্ষুকে অন্নভোজনে আপ্যায়িত করিয়া আলাপের মাধ্যমে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিলেন। রাজা সেই সুগন্ধির কথা ভগবান বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, এই ভিক্ষু অতীত জন্মে ধর্ম শ্রবণ করিবার সময় তিনবার 'সাধু' বাদ প্রদান করিতে করিতে বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যের পরিভাষা অনুসারে

'সাধু' শব্দের অর্থ অতি উত্তর বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করা। তদ্ধেতু ধর্ম শ্রবণান্তে 'সাধু' বাদ প্রদানের ফল স্বরূপ তাঁহার মুখ হইতে সুগন্ধি নিঃসৃত হইতেছে। তদবধি সূত্র আবৃত্তির পর, যে কোন ধর্মীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ভাষণ দানের পর এবং বিবাহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পরিসমাপ্তির পর সমবেত জনসংঘ কর্তৃক করতালির পরিবর্তে তিনবার 'সাধু' (অতি উত্তম) সমস্বরে একত্রে বলিয়া বুদ্ধবাণীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে সম্মতি প্রদান বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

৩। হস্ত-পদ-মস্তক মাটিতে স্পর্শ করতঃ চাদর বা গায়ের কাপড় বাম স্কন্ধে 'একাংশ' করিয়া অনাবৃত মস্তকে বুদ্ধ-প্রতিমূর্তি, ভিক্ষু বা ভিক্ষুসংঘকে তিনবার অভিবাদন করিতে হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল, এই ত্রিসত্য প্রতি পালনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনে দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করা।

৪। রাণী মহামায়া দেবী আষাঢ়ী পূর্ণিমার শেষ রাত্রে নিম্নোক্তরূপ স্বপ্ন দর্শন করেন ঃ-

রাণীর মনে হইল চারিদিকে-পাল-মহারাজা আসিয়া তাঁহাকে শয্যাসহ তুলিয়া নিয়া হিমালয়ের বিরাট শালবৃক্ষের নীচে রাখিয়া এক পার্শ্বে সড়িয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহাদের মহিষীগণ আসিয়া তাঁহাকে অনোতত্ত হ্রদে (মানস সরোবরে) স্নান করাইয়া স্বর্গীয় শয্যায় পূর্বদিকে মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে শোওয়াইলেন। পাপ পরিপূর্ণ মত্যধামে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য দের-ব্রহ্মগণের আরাধনায় তুষিত দেবলোকের শ্বেতকেতু নামক বোধিসত্ত্ব শ্বেত হস্তীর রূপ ধারণ করিয়া সুবর্ণ পর্বতের উত্তর দিক হইতে আসিয়া রৌপ্যমণ্ডিত পর্বতে আরোহণ এবং রজত শুভ্র শুণ্ডে শ্বেতপদ্ম গ্রহণ করিয়া সুবর্ণ অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া মাতৃজঠরে প্রবেশ করিলেন। তৎপর রাণীর অনির্বচনীয়

আনন্দের সঞ্চার হইল। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বোধিসত্ত্বরূপী শ্বেতহস্তী মাতাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া মাতৃজঠরে প্রবেশ করায় এতাদৃশ স্মৃতির স্মরণার্থে বুদ্ধ প্রতিমা, ভিক্ষু বা ভিক্ষুসংঘকে তিনবার নমস্কার করা এবং পঞ্চশীল-অষ্টশীল-দশশীল-উপ-সম্পদা-প্রব্রজ্যা-ফারিক-ক্ষমা প্রার্থনা ও শয়ণাগমন প্রভৃতিতেও তিনবার বলার বিধান বৌদ্ধ সমাজে প্রবর্তিত হইয়াছে।

৫। উপাসনা অথবা ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল গ্রহনের সময় বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সংঘ সদৃশ অনাবৃত মস্তকে নিজ নিজ চাদর বা গায়ের কাপড় খানা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের ন্যায় বামদিকে 'একাংশ' করিয়া (বাম স্কন্ধ উপরি) ব্যবহার করিতে হয়। আর ভগবান বুদ্ধ কৃর্তক বারাণসী জেলার সারনাথে সর্বপ্রথম ধর্ম দেশনা কালীন কোণ্ডান্য, মহানাম, অশ্বজিত, ভদ্রিয় ও বপ্র,-ছবিতে এই পঞ্চ বর্গীয় ভিক্ষুদের উপবেশনের ন্যায় পা দুইখানি পিছনের দিকে রাখিয়া বুকের সামনে হাত জোর করিয়া মনোযোগ সহকারে ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল প্রার্থনা*, প্রার্থনা*, উপাসনা+এবং ধর্ম শ্রবণ করিতে হয়। ভিক্ষুর ন্যায় উপবেশনা করিয়া উপরি উক্ত নিয়নে নম্রতা প্রদর্শনই বৌদ্ধোচিত আচরণ।

[দ্রষ্টব্য ঃ-* প্রার্থনা ঃ- প্রার্থনা শব্দের অর্থ অন্য কাহারও নিকট নিজের ইম্পিত বস্তু পাওয়ার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করা।

+উপাসনা ঃ- উপাসনা শব্দের অর্থ অন্য কাহারও নিকট কিছু না চাহিয়া পালি সাহিত্যেক পরিভাষা অনুসারে ত্রিরত্নের গুণ কীর্তনের মাধ্যমে ধর্মীয় জীবন যাপনে নিজের চরিত্র গঠন করা। 'একাংশ' ১নং দ্রষ্টব্য।]

৬। ভিক্ষু সংঘ বৌদ্ধদের সভা মণ্ডপো আগমন কালে অথবা বিহারে বুদ্ধ পূজার প্রারম্ভে বুদ্ধ পুজা পরিচালনার জন্য বিহারের ভিক্ষু যথাস্থানে

আগমন কালে সমবেত নরনারী বৃন্দ উপবেশন হইতে দণ্ডায়মান পূর্বক ভিক্ষু বা সংঘের প্রতি বৌদ্ধদের সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়।

৭। পথে গমন কালে ভিক্ষু বা ভিক্ষু সংঘের সাক্ষাৎ পাইলে হস্ত পদমস্তক মাটিতে স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করার পরিবর্তে দণ্ডায়মান অবস্থায় বৌদ্ধদের দুইহাত জোর করিয়া তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়।

৮। যে কোন স্থানে ভিক্ষু দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রয়োজন বশতঃ কোন বৌদ্ধদের সঙ্গে আলাপ করিলে উপবেশন হইতে দণ্ডায়মান পূর্বক সম্মান প্রদর্শন করিয়া আলাপ করিতে হয়।

৯। কেহ ভিক্ষুকে নমস্কার করিলে প্রতিদান-স্বরূপ আশীর্বাদ দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট চিত্তে 'সুখিতা হোতু' 'দীর্ঘ জীবি ভবতু' 'চিরং জীবতু' 'নিরোগ্য হোতু' 'সুখে তিট্‌ঠতু' 'জয়তু' ইত্যাদি বলিয়া আশীর্বাদ করিতে হয়।

১০। বৌদ্ধ পর সমুহে সাংসারিক কাজ কর্ম হইতে বিরত হইয়া জাতীয় পোষাক পরিধান করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে প্রত্যেক শ্রদ্ধার সহিত বিহারে বুদ্ধ পূজায় ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে হয়।

১১। বৌদ্ধদের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পরিচালনাকালীন নীরব থাকিতে হয়, ধুমপান করিতে পারে না এবং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতে হয়। ইহাই বৌদ্ধাচিত আচরণ।

১২। বুদ্ধের প্রতি পরিবারস্থ সকলের শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য এবং বুদ্ধের নাম নিত্য স্মরণার্থে বাসগৃহ বুদ্ধের বিভিন্ন ছবি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে হয়।

১৩। বুদ্ধের একটি ছবির সাম্নে প্রদত্ত আসনে প্রত্যহ প্রাতঃকালে

ফুল তুলিতে হয়, দিবা ১২টার পূর্বে আহার্য বস্তু দান করিতে হয় এবং সন্ধ্যাকালে ধুপপ্রদীপ দিতে হয়।

১৪। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে বিহারে কিংবা নিজের ঘরে বুদ্ধধর্ম-সংঘের প্রতি দুইবার উপাসনা করিতে হয়।

১৫। 'ধম্মপদ' ত্রিপিটক শাস্ত্রেরই সারবস্তু। তাই উপাসনার পর প্রত্যহ প্রাতঃকালে কয়েক মিনিট মনোযোগ সহকারে 'ধর্ম্মপদ' এর কয়েকটি গাথা আবৃত্তি করা অতীব মঙ্গলজনক।

১৬। দেশাচার অনুসারে জাতীয় পোষাক পরিধান করিয়া জাতীয় বৈঠকে কিংবা ধর্মীয় সভায় অথবা বিহারে গমন করিতে হয়।

১৭। সিদ্ধার্থ তথা গৌতমবুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণে উপবীতধারী ছিলেন বলিয়া 'মঙ্গল সূত্র' শ্রবণান্তে বৌদ্ধদের ডান হস্তে উপবীতের প্রতীক স্বরূপ ন্যুনকল্পে সপ্তাকালের জন্য পবিত্র সূতা ধারণ করিতে হয়। উপনীত শব্দের অর্থ পবিত্র সূতা।

১৮। 'ঠাকুর' গৃহীলোকের উপাধি (পদবী)। তাই সংসারত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষুকে 'ঠাকুর' না বলিয়া ভন্তে' বলিয়া সম্বোধন করিতে হয়। ভন্তে শব্দের অর্থ গুরুদেব বা প্রভু।

১৯। মৈসাংকে শ্রবণ না বলা। প্রব্রজ্যাধর্মে উপসম্পদা গ্রহণ করতঃ যিনি সংসার ধর্মত্যাগ পূর্বক আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে বিচরণ করিয়া তৃষ্ণার ক্ষয় সাধনে কায়মনোবাক্যে শমতাভাব ধারণ কিংবা চেষ্টা করেন, তিনিই শ্রমণ নামে অভিহিত হয়। শ্রমণ শব্দের অর্থ ভিক্ষু। ভিক্ষুর শিক্ষা নবীশকে মৈসাং বা শ্রামণের বলিতে হয়। শ্রামণের (শ্রমন+মের) শব্দের অর্থ শিষ্য। সম্বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধকেও সূত্রপিটকে বহু সূত্রে শ্রমণ বলা হইয়াছে।

২০। বুদ্ধকে বুদ্ধদেব না বলা। কেননা বুদ্ধ অবতার নহেন। অবতার

জন্মান্তরাধীন বুঝায়, কিন্তু বুদ্ধ তৃষ্ণাক্ষয়ে নিরুপাবিশেষ নির্বাণ প্রাপ্ত বলিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন না। তদ্ধেতু বুদ্ধকে বুদ্ধ বা ভগবান বুদ্ধ বলা আবশ্যক। এই কারণে বুদ্ধের সঙ্গে দেব শব্দ যোগে 'বুদ্ধদেব' নামক শব্দটি ত্রিপিটক গ্রন্থে কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না।

২১। বুদ্ধকে ভগবান বলা হয়। এই ভগবান শব্দের অর্থ ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা নহে। বৌদ্ধ সাহিত্যের পরিভাষা অনুসারে ভগবান শব্দের অর্থ লোভ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ে এবং সম্বোধি লাভে নর-দেব-ব্রহ্ম কুলের মধ্যে জ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভবমুক্ত বলিয়া বুদ্ধকে ভগবান নামে অভিহিত করা হইয়াছে এতাদৃশ গুণ স্মরণে বুদ্ধকে ভগবান বলা হয়। ভগবান গুণের উপাধি।

২২। প্রত্যেক্ষ দিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা কালে যথা সময়ে দুইবার বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের উপাসনা করা এবং নিখুঁতভাবে গৃহীশীল বা পঞ্চশীল কায়মনো বাক্যে প্রতি পালন করাই বৌদ্ধ গৃহীদের স্রোতাপত্তির লক্ষণ। যেমন গৃহী অবস্থায় বিশাখা, অনাথপিণ্ডদ প্রভৃতি বহু স্রোতাপত্তি বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিদৃষ্ট হয়। স্রোতাপত্তি নির্বান লাভের প্রথম স্তর। স্রোতাপত্তি লাভ করিলে মানব কখনও পদস্খলন বা বিপদগামী হয় না। মানব ক্রমশঃ তৃষ্ণাক্ষয়ে নির্বাণ গামী হয়।

২৩। বৌদ্ধরা বুদ্ধমূর্তির সামনে ফুল, প্রদীপ, ধুপ, আহার্য বস্তু প্রভৃতি দ্বারা স্বার্থ সুবিধা আদায়ের জন্য প্রার্থনা করে না। কেবল বুদ্ধ মুর্তির মাধ্যমে বুদ্ধের গুণাবলী স্মরণ করিয়া নিজের মন-মানসকে প্রদীপ্ত করার উদ্দেশ্যে অনুপস্থিত বুদ্ধের প্রতিই বৌদ্ধেরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া উপাসনা করে। এই অর্থেই বুদ্ধ-মুর্তি সম্বোধির প্রতীক স্বরূপ। বুদ্ধের গুণাবলীর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করাই বৌদ্ধদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা বুদ্ধ লোভ -দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ে নিরুপাধিশেষ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত।

নিরুপাধিশেষ পরিনির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি জীবন্ত নহে। এই নিরুপাধিশেষ পরিনির্বানপ্রাপ্ত ব্যক্তি কাহাকেও আশীর্বাদ প্রদান করিতে কিংবা কাহারও বরং প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারে না। এজন্য ইহা মূর্তি পূজা নহে, বরং আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। তাই ধর্ম পিপাসু বৌদ্ধদের জন্য প্রতীক বুদ্ধ চির জ্যোতির্ময় আত্মোপলব্ধির প্রেরণা এবং প্রদীপ্ত প্রজ্ঞা লাভের চির প্রস্রবন।

২৪। বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের ভিক্ষান্ন জীবন যাপন স্মরণ করিয়া ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া এবং অতিথি সেবা করা একান্ত প্রয়োজন।

২৫। চরিত্র গঠন ধর্মীয় জীবন যাপনের জন্য নিজকে শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করা অত্যাবশ্যক। শীল দেবলোক ও মুক্তি মার্গের সোপান। শীলে ভোগ সম্পদ লাভ হয়। শীলবান ব্যক্তি সর্বত্র পুজিত হয়।

২৬। বিপদকালীন ধৈর্যহারা হইয়া বুদ্ধ ব্যতীত ঈশ্বর বা অন্য কোন দেবদেবী প্রভৃতির নাম স্মরণ করা, অথবা কোন দেবদেবী বা নদী প্রভৃতির নামে মানতে করা, অথবা বিধর্মানুষ্ঠানে মানত করা বৌদ্ধ ধর্মানুসারে সম্যক দৃষ্টির বহির্ভূত এবং মিথ্যা দৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত। তাই সম্যক স্মৃতি সহকারে বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের নাম স্মরণ করিয়া বৌদ্ধধর্মানুসারে মানত করা একান্ত প্রয়োজন; যেমন ঃ-বুদ্ধমূর্তি দান করা, ভিক্ষুসংঘকে চতুপ্রত্যয় দান করা, বুদ্ধমূর্তিতে রং দেওয়া শত ব্যক্তি কিংবা হাজারবাত্তি জ্বালান, কোন গরীব ছেলেকে শ্রামণের করিয়া দেওয়া, পুত্রকে ভিক্ষুসংঘে দান করা, চীবর দান করা, শ্রামণেরকে ভিক্ষুত্বে বরণ করা, ভিক্ষু সীমা প্রতিষ্ঠা করা, বোধি বৃক্ষের নীচে মণ্ডপ ঘর প্রস্তত করিয়া দেওয়া, বুদ্ধের আসন দান করা, ক্ষমতানুযায়ী ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ড দান করা, বুদ্ধের প্রতিমূর্তির সামনে নবজাত শিশুর অন্নপ্রাশন করা, বুদ্ধের মস্তক উপরি চাঁদোয়া দান করা, ভিক্ষুর স্নান ঘর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, বিহারে দান বাক্স

দান করা, বিহারে ধর্মীয় গ্রন্থ দান করা, বিহারে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বুদ্ধের বিভিন্ন প্রতিকৃতি (ছবি) দান করা, বিহারে আসবাব পত্র দান করা ইত্যাদি। স্বধর্মানুযায়ী মানত করা এবং বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘকে যে কোন সময়ে সর্বদা স্মৃতি পথে জাগ্রত রাখা বৌদ্ধদের একান্ত প্রয়োজন।

২৭। দানানুষ্ঠান ও শীলাচরণ কুশল কর্মসমূহের প্রতিষ্ঠা। এই সকল কর্ম সম্পাদনে শ্রদ্ধায় বিমণ্ডিত হইয়া মানব ইহ জগত হইতে মৃত্যুর পর দেবব্রহ্মলোক উৎপন্ন হইয়াছে। তাদৃশ কুশলকর্ম সম্পাদিত চিত্তে দেবতানু স্মৃতি ভাবনা করিলে মানব দেবব্রহ্মগণের প্রিয় পাত্র হয় এবং দেবব্রহ্মগণও তাহাকে সর্বদা আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। মৈত্রী ভাবনায়ও কুশলকর্মের প্রভাবে আপদে-বিপদে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর দিকের শক্তিশালী দেবগণের নিকট, সুমেরু পর্বতের পূর্বদিকে ধৃতরাষ্ট্র দক্ষিণ দিকে বিরুঢক-পশ্চিম দিকে বিরুপাক্ষ-উত্তর দিকে কুবের এই চর্তুদিকের চারিজন যশস্বী লোকপাল দেবগণের সমীপে, ঋদ্ধিময় দেবগণ এবং আকাশস্থিত ও ভূমিস্থিত মহাশক্তিশালী দেব-নাগগনের প্রতিও বৌদ্ধ ধর্মে প্রার্থনা করা হইয়াছে। এরূপভাবে পরিত্রাণ পাঠের সময় দেবতাদের সমীপে রক্ষা প্রার্থনা, মহাজয় মঙ্গল গাথা রতনসূত্র, আটানাটিয়সূত্র প্রভৃতি বিভিন্ন সূত্রেও পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু আহার্য স্থূল বস্তু কিংবা প্রাণী বলি দ্বারা সরস্বতী, পূজা, লক্ষ্মী পূজা, শনি পূজা, প্রভৃতি দেবব্রহ্মগণের পূজা করা মিথ্যা দৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত ও অবৌদ্ধচিত আচরণ। কেননা লক্ষ্মী, সরস্বতী, শনি প্রভৃতি দেবব্রহ্মগণ আহার্য স্থূল বস্তু আহার করে না, কোন প্রাণী বলি গ্রহণ করে না। তাহারা ইহলোক সম্পাদিত কুশলকর্মের প্রভাবে দেবব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়া তথায় মত্যধামের সঞ্চিত পুণ্যফল ভোগ করিয়া থাকে। এতাদৃশ কারণে শীলবান ব্যক্তিরাই তাহাদের প্রিয় ও প্রশংসার পাত্র হয়।

শীলবান ব্যক্তিরাই দান, শীল, ভাবনা, কুশলকর্ম, মৈত্রীভাবনা প্রভৃতির প্রভাবেই নিজ নিজ প্রার্থণা অনুযায়ী দেবানুগ্রহ লাভ করিয়া থাকে। ইহার বৌদ্ধোচিত আচরণ।

২৮। দেব দেবীর পূজা না করিয়া বুদ্ধকে দেবাতিদেব জ্ঞানে বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের পূজা করিতে হয়। বুদ্ধ পূজায় প্রদত্ত দানের নৈবেদ্য প্রসাদ রূপে বৌদ্ধদের গ্রহণ করার বিধান নাই। কেননা বুদ্ধ নিরুপাধিশেষ নির্বাণ প্রাপ্ত। নিরুপাধিশেষ নির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি কাহাকেও আশীর্বাদ কিংবা বর প্রদান করিতে পারে না। সে জন্য নৈবেদ্য গ্রহণ করা বিবেক বহির্ভূত।

২৯। হাঁটিতে, বসিতে, দাঁড়াইতে, শুইতে যাবৎ নিন্দা না আসে, তাবৎ এই চারি ইর্ষা পথে সুখে দুঃখে সর্বদা বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের নাম স্মরণ করিতে হয়।

৩০। প্রাচীন কালে ফুস্‌স বুদ্ধের সময়ে তিন মাস ব্যাপী সশিষ্য ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত উত্তম খাদ্য ভোজ্য দান করিবার পূর্বে কাশী রাজার পুত্রগণের নিযুক্ত কার্যকারকদের মধ্যে কেহ কেহ উত্তম খাদ্য ভোজ্যের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া নিজেরা চুরি করিয়া খাইত এবং তাহাদের সন্তানাদিগকেও খাওয়াইত। তাহাদের এই পাপ কর্মের ফলে মৃত্যুর পর সকলেই প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছিল। তদ্ধেতু ভিক্ষু বা ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত খাদ্য ভোজ্য দান করিবার পূর্বে খাওয়া এবং বুদ্ধ পূজার দানীয় সামগ্রী খাওয়া বৌদ্ধদের পক্ষে কোন মতেই সমীচীন নহে। সুতরাং এতাদৃশ কার্যকলাপ অবৌদ্ধচিত আচরণ।

৩১। হিংসা, অহংকার, লোভ, জাত্যাভিমান পরিত্যাগের জন্য এবং অহিংসা নীতি চিত্তে উৎপাদনের জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে গৃহ হইতে গৃহান্তরে সর্বসাধারণের নিকট হইতে ভিক্ষুদের গৃহীত ভিক্ষাপাত্রে

দাতা কর্তৃক স্বহস্তে ভিক্ষান্ন ভিক্ষাপাত্রে প্রদান করা, ইহাই ভিক্ষুদের জন্য বৌদ্ধদের ধর্মনীতি। উরুবিল্ব গ্রামের সেনানী শ্রেষ্ঠীর কন্যা সুজাতা বটবৃক্ষ মূলে বৈশাখী পুর্ণিমা তিথিতে যোগাসনে উপবিষ্ট দেবতুল্য সৌম্যাকান্তিমান বোধিসত্বকে শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে অবনত মস্তকে জোরহস্তে স্বর্ণপাত্রসহ রক্ষিত পরমান্ন তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিলেন। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে দুইহাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিলেন। এরূপ ভাবে ভিক্ষুদের হাতে দানীয় বস্তু তুলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত ভিক্ষুদের গ্রহণ করা বৌদ্ধ ধর্মানুসারে নিষিদ্ধ। এতাদৃশ কারণে সমস্ত দানীয় বস্তু ভিক্ষুদের হাতে তুলিয়া দেওয়া প্রথা বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। সেইজন্য বৌদ্ধ সমাজে সমস্ত দানীয় বস্তু ভিক্ষুদের হাতে তুলিয়া দিতে হয় ইহাই বৌদ্ধচিত আচরণ।

৩২। পোষাক-পরিচ্ছেদ, পথে গমণকালে, আলাপে-ব্যবহারে এবং আহারের সময়ে বিনয় সম্মত ৭৫টি শৈক্ষ ধর্মের শিষ্টচার পালন করিতে হয়। শৈক্ষ ধর্মই বৌদ্ধচিত জীবন যাপন গঠনের একমাত্র উপায়। (দ্রষ্টব্যঃ শৈক্ষ ধর্ম প্রাতিমোক্ষ।)

৩৩। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সমস্ত প্রাণীকে সুখে দুঃখে আত্মবৎ মৈত্রীভাব প্রদর্শনে অহিংসা নীতি পালন করিতে হয়।

৩৪। আক্রমণকারীকে বীর্য সহকারে প্রতিরোঘ করা অত্যাবশ্যক। ইহা বৌদ্ধদের আত্মরক্ষার জন্য অপরিহার্য কর্তব্যকর্ম।

৩৫। চিঠি বা বিজ্ঞপ্তি লিখিবার সময় চিঠি বা বিজ্ঞপ্তির উপরিস্থিত মধ্যভাগে

সর্বপ্রথমে 'নমো তস্স' বা ' নমো বুদ্ধায়' বা 'মনো তিরতনায়' বা 'বন্দে তিরতনং' বা 'জয়তু বুদ্ধ সাসনং' ইত্যাদি লিখিয়া বৌদ্ধদের নিকট চিঠি বা বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু লিখিতে হয়।

৩৬। ভগবান বুদ্ধের নিম্নোক্ত 'সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম' সম্বন্ধে উপদেশ বৌদ্ধ মাত্রই প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক। যথা ঃ

ক) সর্বদা সম্মিলিতভাবে কর্মসূচী নির্ণয় করা।

খ) নির্ধারিত কর্মসূচী একত্রে সম্পাদন করা।

গ) রাষ্ট্রের আইন ও শৃঙ্খলা পালন করা।

ঘ) বয়ঃবৃদ্ধদের সম্মান প্রদর্শন করা।

ঙ) স্ত্রী জাতির মর্যাদা রক্ষা করা।

চ) জাতীয় ধর্ম প্রতিপালন করা।

ছ) ধর্মগুরুদের সম্মান ও সুখ স্বাচ্ছন্দ বিধান করা।

বুদ্ধের প্রদর্শিত এই সাতটি উপদেশ প্রতিপালনই বৌদ্ধচিত আচরণ এবং জাতীয় উন্নতির একতার নিদর্শন।

৩৭। ভিক্ষুদের ২২৭ শীলে, শ্রামণদের দশ শীলে এবং গৃহী উপোসথ পালনকারীদের অষ্টশীলে 'নাচ,গান, বাদ্য প্রভৃতি উৎসুক চিত্তে দর্শণ, মালগন্ধ বিলেপন ধারণ-মণ্ডণ, বিভূতির কারণ' হইতে বিরত থাকার জন্য ভগবান বুদ্ধ নিত্য শীলের অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন। তদ্ধেতু ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত শীলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ বিহারে অবৌদ্ধচিত নাট্যাভিনয় করা বা অবৌদ্ধচিত করিতে দেওয়া কোন মতেই সমীচীন নহে। ইহা প্রতিপালন করাই বৌদ্ধচিত আচরণ।

৩৮। মাছ-মাংস বাণিজ্য, হত্যার কারণে প্রাণী বাণিজ্য, বিষ বাণিজ্য, অস্ত্র বাণিজ্য ও নেশাদ্রব্য বাণিজ্য লব্ধ অর্থ কিম্বা যে কোন অসদুপায়ে জীবিকা নির্বাহ করা বৌদ্ধধর্ম মতে নিষিদ্ধ। ইহা আচরণ করাই বৌদ্ধ জাতির লক্ষণ।

৩৮ (ক)। ত্রিশরণই বৌদ্ধ ধর্মের বীজ মন্ত্র। 'বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামিং, সংঘং সরণং গচ্ছামি" এবং বুদ্ধম্ সরণম্

গচ্ছামি, ধম্মম্ সরণম্ গচ্ছামি, সংঘম্ সরণম্ গচ্ছামি" এই ত্রিশরণের উভয় প্রকার উচ্চারণই শুদ্ধ। প্রথম অনুস্বারান্ত বাক্যে ত্রিশরণের শব্দগুলি পৃথক পৃথক শব্দ এবং শেষোক্ত হসন্তযুক্ত 'ম' (ম্) বাক্যে ত্রিণরণের শব্দগুলি যৌগিক শব্দ অর্থাৎ সন্ধির সূত্রানুসারে একটি শব্দ। কিন্তু কেবল প্রব্রজ্যা প্রদান কালে প্রব্রজ্যাপ্রদানকারীকে হসন্ত যুক্ত 'ম' (ম্) উচ্চারণে প্রব্রজ্যাপ্রদানকালে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও প্রব্রজ্যাপ্রদানকারী উভয়ের উচ্চারণ বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। নাগেরা কেবল ম-কারান্ত যৌগিক শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না। তজ্জন্য প্রব্রজ্যাপ্রদানকালে ম কারান্ত যৌগিক শব্দে ত্রিশরণ উচ্চারণ বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিহিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতাদৃশ কার্যকলাপ বৌদ্ধোচিত আচরণ।

৩৯। কেহ কেহ মনে করেন, বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের শাখা; কিন্তু একথা সত্য নহে। কেননা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদ, বেদের যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড, পশুবলি, দেবদেবীর পূজা বা প্রার্থনা, ব্রত উপবাস, কৃচ্ছ সাধনা, জাতিভেদ প্রথা, সমুদ্রস্নানে বা গঙ্গাস্নানে অথবা আত্মপাক ভোজনে চিত্তবিশুদ্ধি, ব্রাহ্মণের যাজক বৃত্তি, অদৃষ্টবাদ, মহোৎসব অন্ধ বিশ্বাস, গুরুপ্রদত্ত বীজ মন্ত্র গুহ্যধর্ম, শাশ্বত আত্মা, ঈশ্বর বেদ অপৌরষেয়, ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন সর্বসাধারণের বেদ পাঠের অনধিকার, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, অবতারবাদে, ব্রহ্ম বৈলিন্য প্রাপ্তিই একমাত্র জন্মমৃত্যুর রহস্যভেদ প্রভৃতি কিছুই বুদ্ধ স্বীকার করেন নাই। তজ্জন্য বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক কোন ধর্মকর্ম সম্পাদন করেনা। এতাদৃশ বিপ্লবে হিন্দু সমাজের যে কোন চতুবর্ণের সহিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শুদ্রের সহিত বৌদ্ধদের সমাজগত বৈবাহিক সম্বন্ধেও স্থাপিত হয় না। যে কোন মহোৎসবে বা যে কোন ধর্মীর অনুষ্ঠানে হিন্দুগণ বুদ্ধের নাম নিয়া সংকীর্তন সহকারে তাঁহার গুণকীর্তনও করেনা এবং বুদ্ধমুর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা অচনাও করেনা। বেদান্ত

মতে চিত্ত বিশুদ্ধিতার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মভুত হন। সেই জন্য বেদান্তে ব্রহ্মপদ ও ব্রহ্ম নির্বাণের বর্ণনা একই প্রকার। হিন্দুধর্মে ইহাকেই বলা হয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বা কৈবল্যপ্রাপ্তি। হিন্দু ধর্মমতে দ্বাপর যুগে কুরু ও পাণ্ডবের মধ্যে কুরুক্ষেত্র নামক যুদ্ধ ক্ষেত্রে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ গীতার একটি শ্লোকে বলেন,

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
(গীতা ৪।৭-৮)

যখনই ধর্মের গ্লানি ও অর্ধমের অভ্যুত্থান হয়, সেই সময়েই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পরিত্রাণ এবং ধর্ম পুনরায় মত্যধামে সংস্থাপনের জন্য পুর্ণ ব্রহ্ম ব্রহ্মলোক হইতে যুগে যুগে আবির্ভূত হয়।

এই আবির্ভূত ব্যক্তিই অবতার নামে অভিহিত হয়। এই অবতার জীবন্ত বলিয়া মানবের ইস্পিত প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারে বলিয়া হিন্দুদের বিশ্বাস।

যেখানে হিন্দু ধর্মের পরিসমাপ্তি বা কৈবল্য প্রাপ্তি, সেখান হইতে প্রকৃত পক্ষে বোধিজ্ঞান লাভের জন্য বৌদ্ধ ধর্মের অগ্রগতি। বৌদ্ধ ধর্মে যিনি বোধিজ্ঞান লাভের জন্য কল্প কল্পান্তর দশ পারমিতা, দশ উপ-পারমিতা, দশ পরমার্থে পারমিতা পূর্ণ করিতে থাকেন, তাঁহাকেই বলা হয় বোধিসত্ব। এই বোধিসত্ব বোধিজ্ঞান লাভ করিলেই বুদ্ধ নামে অভিহিত হন। বুদ্ধ সর্ববিধ তৃষ্ণা ক্ষয়ে সোপাধিশেষ নির্বাণ প্রাপ্ত। নিরুপাধিশেষ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি কখনও মতাধামে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে না। এই নিরুপাধিশেষ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি জীবন্ত

নহে বলিয়া কাহারও ইস্পিত প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারে না। মত্যধামে বুদ্ধ পুনরায় অবর্তীণ হয় না বলিয়া বুদ্ধ অবতার নহেন। বৌদ্ধধর্ম মতে মানব পুণ্যকর্ম করিয়া দেবব্রহ্ম লোকে জন্ম গ্রহণ করে। মত্যধামের সঞ্চিত পুণ্য রাশি পরিভোগ সমাপ্ত হইলে আবার দেব ব্রহ্মগণ দেব ব্রহ্ম-লোম হইতে চ্যুত হইয়া মতাধামে জন্ম গ্রহণ করে। সেই জন্য ভগবান বুদ্ধ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিকে চরম বিমোক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সুতরাং ব্রহ্মনির্বাণ ও বৌদ্ধনির্বাণ অভিন্ন মুক্তিপদ নহে। এই কারণে বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্মের বিপ্লবী ধর্ম ও হিন্দুধর্মের শাখা রূপে ভ্রান্ত ধারণার অভিমত পোষণ করা এবং জন সমাজে প্রচার করা নিতান্ত অন্যায়, যুক্তিবিহীন ও সম্পূর্ণ বিবেক বহির্ভূত। তাইত স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো নগরে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনের ধর্ম সভায় ভাষণ দান কালে স্বীকার করিয়াছিলেন Buddhism is the fulfilment of Hinduism. অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মই হিন্দুধর্মের পরিপুরক।

৪০। মহারাজ অশোক ভিক্ষু উপগুপ্তের উপদেশে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ধর্মের উন্নতি করে ৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে ভারত বর্ষের ৮৪ হাজার নগরে ৮৪ হাজার বিহার ও ৮৪ হাজার ধাতু চৈত্য নির্মাণ করেন এবং স্থানে স্থানে শিলাস্তম্ভে ও পর্বতগারে উপদেশ মূলক স্মারকলিপি স্থাপন করেন। সদ্ধর্মের স্থিতির জন্য বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের পর ২৩৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে তাঁহারই অর্থানুকূল্যে তখনকার সংঘনায়ক মৌদ্গলিপুত্র তিষ্য মহাস্থবিরের নেতৃত্বে তৃতীয় ধর্ম সঙ্গীতিতে সর্ব প্রথম ত্রিপিটক শাস্ত্র পালি ভাষায় ব্রাহ্মী অক্ষরে তাল পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। তাঁহারই প্রচেষ্ঠায় তদানীন্তন ভারতে ও ভারতের বাহিরে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। এতাদৃশ সৎকার্য সম্পাদন করিয়া তিনি তখন কার সংঘনায়ক মৌদ্গলি পুত্র তিষ্য মহাস্থবির প্রমুখ সংঘকে ধর্মের উত্তরাধিকার

সম্বন্ধে জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিয়া ছিলেন যে পুত্র পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের ন্যায় নিজের ঔরষজাত সন্তানকে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত করিয়া না দিলে এবং নিজেও শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত না হইলে কেহই বৌদ্ধধর্মের উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারে না। তজ্জন্য তিনি বৌদ্ধ ধর্মের উত্তরাধিকার লাভের জন্য তাঁহার ঔরষজাত সন্তান মহীন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজেও শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন। তাঁহাদের প্রব্রজ্যা গ্রহণ কালে অশোকের ছয় বৎসর রাজত্বকালে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। একমাত্র দশ বর্ষাবাস পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত অভিজ্ঞ ভিক্ষুগণই প্রব্রজ্যা প্রদানের অধিকারী। শ্রামণের বয়স বিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে উপসম্পদা প্রাপ্ত হইতে পারে। উপসম্পদা প্রদানকালে ন্যুনকল্পে দশজন ভিক্ষুর প্রয়োজন। অবশ্য যত অধিক শীলবান ভিক্ষু হয়, ততই উত্তম। তদবধি সংসার ধর্মে প্রবেশের পূর্বে বুদ্ধের প্রব্রজ্যা ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য এবং বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকার লাভের প্রত্যাশায় অভিভাবকগণ কর্তৃক প্রত্যেক ছেলেকে কিছু দিনের জন্য সাময়িকভাবে হইলেও বৌদ্ধ সমাজে শ্রামণের প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহা যথোচিত উৎসব সহকারে সম্পাদন করা প্রত্যেক ছেলের অভিভাবকের অত্যাবশ্যকীয় সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্যকর্ম।

৪১। বোধিসত্ব রূপী সিদ্ধার্থ তথা ভগবান গৌতম বুদ্ধ মাতৃ জঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণের সময় একটি শ্বেত হস্তী রজত শুণ্ডের অগ্রভাগে শ্বেতপদ্ম গ্রহণে রাজ মহিষী মহামায়া দেবীর দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ সদৃশ মহামায়াদেবী আষাঢ়ী পুর্ণিমা তিথিতে স্বপ্ন দর্শন করেন এবং মাতৃগর্ভ হইতে বৈশাখী পুর্ণিমা তিথিতে পূর্বমুখী ভূমিষ্ট হইয়া উত্তর দিকে সপ্তপদ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৈব প্রভাবে প্রত্যেক পদক্ষেপে পদ্মফুল বিকশিত হয়। ভগবান বুদ্ধ

ষড়াভিজ্ঞ সম্পন্ন পঞ্চশত অরহত ভিক্ষুসহ হিমালয়ের অনতি দূরে অনবতপ্ত হ্রদে (মাসন সরোবরে) সর্ব প্রথম কঠিন চীবর দানে ফলে বর্ণনা করিবার সময়ে উক্ত ভিক্ষু সংঘ ভগবান বুদ্ধকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিলে ভগবান বুদ্ধ সহস্রদল *বিকশিত পদ্মে এবং পঞ্চশত অরহত ভিক্ষু বিকশিত পদ্মে প্রত্যেকে পদ্মাসনে উপবেশন করেন। তৎপর নাগিত স্থবির ও ভগবান বুদ্ধ কঠিন চীবর দানের ফল বর্ণনা করেন। অতঃপর ভগবান বুদ্ধে অন্তিমকালে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে তৎকালীন প্রথিত যশা চিকিৎসক জীবক পদ্মফুলে ঔষধ প্রয়োগ করেন এবং ভগবান বুদ্ধ সেই পদ্ম ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া আরোগ্য লাভ করেন।

বুদ্ধ বিদ্বেষী জৈন সন্ন্যাসীগণ কর্তৃক বুদ্ধের দন্তধাতু বিনাশের জন্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষনাৎ দন্তধাতুর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে অগ্নিরাশির অভ্যন্তর হইতে প্রস্ফুটিত পদ্মে স্থিত হইয়া শুভ্রজ্যোতি: বিকীর্ণ করিয়া চতুর্দিক আলোকিত করে। পুনরায় জৈন সন্ন্যাসীগণ কর্তৃক পচামৃত দেহাদি পূর্ণ ঘৃনিত পরিকার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে দন্তধাতুর ঋষি-প্রভাবে বিকশিথ পদ্মে দন্তধাতুর স্থিত হইয়া শুভ্র জ্যোতি: বিকীর্ণ করিয়া চতুর্দিক আলোকিত করে। এইরূপে জৈন সন্ন্যাসীগণ যতবার বুদ্ধের দন্তধাতু বিনাশের অপচেষ্টা করেন, ততবার বুদ্ধের দন্তধাতু বিকশিত পদ্মফুলে স্থিত হইয়া শুভ্রজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে থাকে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সমস্ত ফুলের মদ্যে পদ্ম ফুলই ভগবান বুদ্ধের অতীব প্রিয় ও মনোরম দায়ক তদ্ধেতু ভগবান বুদ্ধকে তাঁহার মনোরম দায়ক প্রিয় পদ্মফুল দ্বারা শ্রদ্ধা নিবেদন করা একান্ত কর্তব্য। তাই বর্তমান কালে কোন কোন বিহারের দায়কদায়িকাবৃন্দ প্রকৃত পদ্মফুলের অভাবে ভক্তি শ্রদ্ধার নিদর্শণ স্বরূপ শসা, বাতাবী লেবু, কাঁচা পেপে, আনারস প্রভৃতি ফলে কারুকার্য খচিত কৃত্রিম পদ্মফুল প্রস্তত করিয়া বুদ্ধ পূজা

করিয়া থাকে।

৪২। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে গয়া জেলার উরুবিল্ব গ্রামের সেনানী শ্রেষ্ঠীর কন্যা সুজাতা পরমান্ন সহ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ পাত্র দান করিবার সময়ে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমনের দিনে তাঁহার অতীত জন্মের প্রাচীন বন্ধু কুম্ভকার মহাব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত মাটির পাত্রটি দৈব প্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সিদ্ধার্থ নৈরঞ্জনা নদীতে স্নানের পর সুজাতা প্রদত্ত স্বর্ণ পাত্র হইতে ঊনপঞ্চাশ গ্রাসে ঊনপঞ্চাশ দিনের খাদ্য ভোজানান্তে সত্যক্রিয়া করিয়া খরস্রোতা নৈরঞ্জনা নদীর ঊর্ধদিকে স্বর্ণ পাত্রটি নিক্ষেপ করিলে স্রোতের প্রতিকূলে প্রবাহিত হইয়া নদীর গভীরমত তলদেশে নাগরাজ কালের ভবনে পূর্ববর্তী 'ককুসন্ধ, পেনাগমণ, কশ্যপ' এই তিন বুদ্ধের তিনটি পাত্রের সঙ্গে মিলিত হইয়া সংবর্ষণে স্বীয় আগমণ সঙ্কেত ঘোষণা করিয়া সর্বনিম্নে প্রতিষ্ঠিত হইল। তৎপর অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে পদ্মাসনে মারবিজয়ে বোধিজ্ঞান লাভ করিয়া সপ্ত সপ্তাহ সপ্ত স্থানে ধ্যান সুখে বিমগ্ন থাকার পরদিবস উৎকল বাসী তপস্সু ও ভল্লিক নামক বণিকদ্বয় মন্থ (ভাজা যব ও ছোলার গুঁড়া) ও মধুপিণ্ড (চর্বি, মধু ও গুড়; মিশ্রিত লাড়ু) দান করিবার সময়ে বুদ্ধ ভাবিতে লাগিলেন,– বুদ্ধগণ হস্ত দ্বারা আহার্য গ্রহণ করেন না। তখন তাঁহার চিত্তদ্বন্দ্ব অবগত হইয়া চারিদিক পাল মহারাজা চারটি ইন্দ্রনীলমণি পাত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ সেই পাত্রগুলি গ্রহণ করিলেন না। তৎপর দিকপাল মহারাজাগণ পুনরায় চারিটি কৃষ্ণ মুগবর্ণ শিলাময় পাত্র উপস্থাপিত করিলেন। তাঁহাদের প্রতি সম-অনুকম্পা প্রদর্শনার্থে বুদ্ধ চারটি পাত্র গ্রহণ করিয়া উপর্যুপরি স্থাপন করিলেন এবং পাত্রগুলি একটি পাত্রে পরিণত হউক,–এইরূপ ইচ্ছা চিত্তে উৎপাদন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে চারিটি পাত্র দৈব প্রভাবে একটি পাত্রে পরিণত হইল। কেবল মাত্র পাত্রটির চতুপার্শ্বে উপর হইতে নিম্নে চারটি সুস্পষ্ট

রেখা পাত্রগুলিই অস্থিত্ব প্রমাণ করিতেছিল। তখন বুদ্ধ সেই অভিনব শিলাময় পাত্রটিতে মন্থ ও মধুপিণ্ড গ্রহণ করিলেন। সেই জন্য চারি রেখা বিশিষ্ট কৃষ্ণ শিলাময় পাত্র ভিক্ষু সংঘকে দান করাই উত্তম।

৪৩। বুদ্ধের জীবমানকালে ও ভগবান বুদ্ধের পরবর্তীকালে বিহারগুলি ছিল ধর্মীয় শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থান। তাই বর্তমান যুগেও অতীতের বৌদ্ধ ঐতিহ্য স্মরণ বিহারের ভিক্ষু ও দায়ক দায়িকা বৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় স্কুল ও কলেজের বন্ধের দিন সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন হইলেও বাল্যকালে কোমলমতি ছেলে-মেয়েদিগকে প্রাতঃকালে দুই তিনঘন্টা 'ধর্মীয় শিক্ষা, শৈক্ষ ধর্ম ও উপাসনা পদ্ধতি'র নিয়মাবলী শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

৪৪। কোন কোন বৈবাহিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে দেখা যায়, মেয়ের পিতা বা অভি-ভাবক কর্তৃক মেয়ে সম্প্রদানের পূর্বে ভিক্ষু বা ভিক্ষুগণ কর্তৃক সন্ধ্যার পর বরের বস্ত্র-গ্রহের উঠানে বর কনের ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ ও পরিত্রাণ সূত্রাদি শ্রবণ করা হয়। কিন্ত ইহা যুক্তিপূর্ণ ও বিবেক সঙ্গত বৌদ্ধোচিত আচরণ নহে। কেননা বস্ত্র-গৃহের ফুলশয্যা কক্ষে বর-কনের ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ ও পরিত্রাণ সূত্রাদি শ্রবণের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল সুকর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ বপন সদৃশ ফুল শয্যাকক্ষের সর্ববিধ উপদ্রবের বিনাশ সাধনে উক্ত কক্ষকে মঙ্গল সূত্রাদি পাঠ পরিশুদ্ধ করাই বৌদ্ধদের একমাত্র অন্তর্নিহিত বিশ্বাস এবং সেই কক্ষে পরিত্রাণ সূত্র পাঠ পবিত্র সূতাখানি উক্ত কক্ষের ভিতরে চতুর্দিকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করিয়া দেওয়াই বৌদ্ধোচিত আচরণ নহে। কেননা বসথ-গৃহের ফুলশয্যা কক্ষে বর-কনের ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ ও পরিত্রাণ সূত্রাদি শ্রবণের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল সুকর্ষিত ক্ষেত্রে জীবন যাপন সদৃশ ফুল শয্যাকক্ষের সর্ববিধ্ উপদ্রবের বিনাশ সাধনে উক্ত কক্ষকে মঙ্গল সূত্রাদি পাঠ পরিশুদ্ধ করাই বৌদ্ধদের একমাত্র অন্তর্নিহিত বিশ্বাস এবং সেই

কক্ষে পরিত্রাণ সূত্র পাঠ পবিত্র সূতাখানি উক্ত কক্ষের ভিতরে চতুর্দিকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করিয়া দেওয়াই বৌদ্ধোচিত আচরণ।

৪৫। যে কোন মেয়ের নিরূপিত বিবাহ-লগ্নে শ্বশুরালয়ে গমনকালীন দিবসে বা তদ্‌পূর্ব দিবসে স্থানীয় বিহারের ভিক্ষু বা ভিক্ষুসংঘকে ইহ-পরকালের হিতার্থে উক্ত মেয়ে কর্তৃক পিণ্ড দানান্তে ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল গ্রহণ করা এবং মঙ্গল সূত্রাদি ধর্মীয় কথা ও শ্বশুরালয়ের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিয়া ধর্মীয় গুরুর আশীর্বাদ গ্রহণ করণই বৌদ্ধধর্মানুসারে অত্যাবশ্যক। ইহা ভগবান বুদ্ধের জীবমানকালেও প্রচলিত ছিল।

৪৬। যে কোন বরের বাড়ীতে নিরূপিত বিবাহ-লগ্ন দিবসে ইহ পরকালের হিতার্থে নিজ বিহারে ভিক্ষু বা ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান করিয়া ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল গ্রহণ করা এবং মঙ্গল সূত্রাদি ধর্মীয় কথা শ্রবণ করা, সাংসারিক জীবন যাপনের কর্তব্য, কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করাই বৌদ্ধধর্মের নীতি।

৪৭। সাংসারিক জীবন যাপনের সময় প্রাণী হত্যায় সম্পূর্ণ বিরত হইতে না পারিলেও অন্ততঃ মৃত ব্যক্তির সাপ্তাহিক কর্মে, অষ্ট পরিষ্কার দানাদি উৎসর্গে, যে কোন ধর্মীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এবং বৌদ্ধ পর্বাদিতে হইলেও প্রাণি-হত্যা কিংবা প্রাণি-হত্যার হেতু অথবা প্রাণি-হত্যার উৎসাহ দান করা হইতে অনাসক্ত হইয়া অহিংসা নীতির স্মৃতি ও চিত্তের চেতনা উৎপাদনার্থে বৌদ্ধধর্মানুসারে শুদ্ধাহার সমাজে প্রবর্তন করা বৌদ্ধদের অবশ্য কর্তব্য কর্ম।

৪৮। বুদ্ধের প্রতিমুর্তি বা বুদ্ধের ছবিকে সামনে প্রতীক স্বরূপ রাখিয়া পদ্মাসনে *সংযত চিত্তে উপবেশন করতঃ চিত্তের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সদ্ধর্ম অনুশীলন করা প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য।

[দ্রষ্টব্যঃ-পদ্মাসনঃ- বাম উরুর উপরে দক্ষিণ পদ, দক্ষিণ উরুর উপরে বামপদ এবং দক্ষিণ পদের উপরে বাম হস্ততল নিম্নমুখে রাখিয়া, বামপদের উপরে দক্ষিণ হস্ততল উর্ধমুখে রাখিয়া নাসিকার অগ্রভাগের উপর সৃষ্টি রাখিয়া মুখ বন্ধ করতঃ চক্ষু নিমীলিত অবস্থায় সোজা শরীরে উপবেশনের নাম পদ্মাসন। ইহার অপর নাম যোগাসন বা বীরাসন বা বজ্রাসন।]

৪৯। সিদ্ধার্থ পূর্বমুখী হইয়া জন্ম গ্রহণ, পূর্বদিক দিয়া মহাভিনিষ্ক্রমণ, মহাভিনিষ্ক্রমণের পর সর্ব প্রথম মিশ্রিত ভিক্ষান্ন পূর্বমুখী ভক্ষণ, বোধিজ্ঞান লাভের অব্যবহিত পূর্বে গয়া জেলার উরুবিল্ব গ্রামের সেনানী শ্রেষ্ঠীর কন্যা সুজাতা প্রদত্ত দিব্যশক্তি প্রভাবে পরিশেষে অষ্ট গাভীর স্বতঃই ক্ষরিত দুগ্ধ ও ওজ মিশ্রিত নির্জলা মধুর পরমান্ন ৪৯ গ্রাসে পূর্বমুখী হইয়া নিঃশেষে ভোজনের পর সন্ধ্যাকালে বোধিমণ্ডপ অভিমুখে গমনকালে সোত্থিয় নামে একজন তৃণ সংগ্রহকারী তাঁহার মাঙ্গল্য লক্ষণে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সেই মহান পুরুষের হস্তে আট মুষ্টি তৃণ দান করিল। মহান পুরুষ তৃণগুচ্ছ সমূহ হাতে লইয়া বোধিমণ্ডপে আরোহণ করিয়া ক্রমান্বয়ে উত্তর মুখী, পশ্চিম মুখী, দক্ষিণ মুখী দণ্ডায়মান হইলে তাঁহার মনে হইল,–দিগ্‌সমূহ নিম্নদিকে অবীচিনরকে যুক্ত হইতেছে এবং ইহাদের বিপরীতদিক উর্ধগামী হইয়া ভাবগ্র (ব্রহ্মলোক) স্পর্শ করিতেছে। সেই মহান পুরুষ 'এই তিন দিক সম্বোধি লাভের স্থান নহে' চিন্তা করিয়া পূর্বমুখী দাণ্ডায়মান হইলেন। প্রকৃত পক্ষে পূর্বদিকই সকল বোধিসত্ত্বের বোধিপালঙ্কের স্থান। কোন অবস্থায় তাহা চালিত বা কম্পিত হয় না। ইহা সমস্ত বুদ্ধগণের সম্বোধিলাভের যথার্থ স্থান,–দিব্য জ্ঞানে তাহা হৃদয়ঙ্গম করার পর সেই মহান পুরুষ বোধিমণ্ডপের উপরিভাগ তুর্ণ সমূহ ছড়াইয়া দিলেন। দৈব প্রভাবে সূক্ষ্ম নিয়মে বিন্যস্ত হইয়া তাঁহার চৌদ্দ হস্ত পরিমিত এক বিস্তৃত আসন রচিত হইল। তৎপর

সেই মহান পুরুষ অশ্বত্থ বৃক্ষকে পশ্চাতে রাখিয়া এবং নৈরঞ্জনা নদীকে সামনে রাখিয়া পূর্বদিকে মুখ করিয়া সূর্যালোক সদৃশ তাঁহার সম্বোধি লাভ না হওয়া পর্যন্ত এই উপবিষ্ট পদ্মাসন ত্যাগ করিবেন না বলিয়া দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হইলেন। এই সংকল্প গ্রহণ করিয়া সেই অপরাজেয় পালঙ্কে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মার বিজয়ে সম্বোধি লাভ করায় উপরোক্ত কারণে দিক সমূহের মধ্যে পূর্বদিককে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়। অতীত বুদ্ধগণের ন্যায় আমাদের বর্তমান গৌতমবুদ্ধও পূর্বমুখী হইয়া পদ্মাসনে উপবেশন পূর্বক অধিষ্ঠান করিয়া সম্বোধি লাভ করায় বৌদ্ধ বিহার পূর্বমুখী নির্মাণ করিয়া বুদ্ধমূর্তি পূর্বমুখী করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। বুদ্ধ যাহা প্রজ্ঞা বলে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ মাত্রেই শ্রদ্ধাচিত্তে অনুকরণ করাই বৌদ্ধোচিত আচরণ।

৫০। মনের চ্যুতি ও উৎপত্তির ব্যাপারে দেহান্তর গমনের জন্য সপ্তাহ কালের প্রয়োজন। তাই মৃত ব্যক্তির কর্মবিপাকস্থিত প্রেতজন্ম হইতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে তাহার জন্য সপ্তাহ কালের মধ্যে ভিক্ষুগণকে সংঘদান করিতে হয়। সংঘদানে কম পক্ষে চারিজন ভিক্ষুর প্রয়োজন। অবশ্য সংঘদানে যত অধিক শীলবান ও জ্ঞানবান ভিক্ষু হয়, ততই উত্তম।

৫১। সারনাথে ভগবান বুদ্ধের প্রথম বর্ষাবাসের পর বেনুবনে অবস্থানকালে এক সময়ে মগধের রাজা বিম্বিসার তাঁহার প্রাসাদে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘের আহার কৃত্য সমাপ্ত হইলে মৃত জ্ঞাতি আত্মীয়স্বজন প্রেতাদিগের উদ্দেশ্যে দানোৎসর্গ সম্পন্ন না করায় রাজা রাত্রিতে বিভীষিকাময় স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি প্রাতে বেনুবন বিহারে বুদ্ধের নিকট গিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসাবাদে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার মৃত জ্ঞাতি আত্মীয়স্বজন প্রেতলোকের দুঃখ-প্রাপ্তি হইতে মুক্তির জন্য এতাদৃশ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছেন। তৎশ্রবনে

রাজা বিম্বিসার বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে আবার পরিদিবসের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া মৃত জ্ঞাতি আত্মীয় স্বজনের দানোৎসর্গ কার্যাদি সম্পন্ন করিলেন। তিনি দানোৎসর্গের সময়ে ভগবান বুদ্ধের ঋদ্ধিপ্রভাবে স্বচক্ষে মৃতজ্ঞাতি আত্মীয়-স্বজনের দর্শনলাভ এবং তাহারা এখান হইতে দানীয় বস্তু সেখানে প্রাপ্ত হইয়া উপভোগ করে, তাহাও স্বচক্ষে দর্শন লাভ করিলেন। তদ্ধবধি পরলোকগত মাতা-পিতা আত্মীয়-স্বজনের জন্য সংবদান প্রথা বা পিণ্ডদান প্রথা বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ 'তিরোকুড্ড' সূত্রে পরিদৃষ্ট হয়। তদ্ধেতু কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস করিয়া প্রত্যেক বৎসর প্রেতলোক হইতে মুক্তির জন্য পরলোকগত মাতা পিতা ও গুরুজনের উদ্দেশ্যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান করা অত্যাবশ্যক।

৫২। ভগবান বুদ্ধ প্রথম-বর্ষাবাসের পর রাজাগৃহে অবস্থান কালে মগধরাজ বিম্বিসার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রত্যেক মাসের অমাবস্যা, পূর্ণিমা, শুক্ল পক্ষের ও কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথি,–এই চারিদিন উপোসথ শীল প্রতিপালনে সমবেত হইয়া ধর্মালোচনায় ও ধর্মোপদেশে নিবিষ্ট হইতে অনুজ্ঞা প্রদান করেন। অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল গ্রহণের পর সুসংযতভাবে জপমালায়, ধর্মগ্রন্থে অথবা ধর্মালোচনায় চিত্তকে নিবিষ্ট রাখা কর্তব্য। এইরূপে আর্য উপোসথ পালনকারী বর্তমান জন্মে যথেষ্ট প্রীতি উপভোগ করে এবং পরকালেও অপরিসীম সুখ শান্তির অধিকারী হয়। ধর্মীয় জীবন গঠণের জন্য মহাফলপদ আর্য উপোসথ শীল সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন এবং বৌদ্ধদের অপরিহার্য কর্তব্যকর্ম।

৫৩। সুমঙ্গল বুদ্ধের সময় আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব অতীত জন্মে উত্তরীয় নামক নগরে সুরুচি ব্রাহ্মণ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সুরুচি ব্রাহ্মণ। তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে সপ্তাহকালে অষ্ট পরিষ্কার (উপকরণ) দান করিয়া ছিলেন (১) অর্ন্তবাস (ভিক্ষুদের

নিত্য পরিধেয় চীবর, অনেকটা লুঙ্গির ন্যায়) (২) উত্তরাসঙ্গ (একাজিম, পাঁচ হাত লম্বা চারি হাত প্রস্থ সর্বদা শরীরের উপরে ব্যবহারের এক পাট্টা চীবর), (৩) সংঘাটি (দোয়াজিক, পাঁচ হাত লম্বা চারি হাত প্রস্থ দোপাট্টা চীবর। শীত নিবারণ ও অন্যান্য কয়েকটি প্রয়োজনে ইহা ব্যবহৃত হয়), (৪) ভিক্ষা পাত্র (ছাবাইক), (৫) ক্ষুর, (৬) সূচ-সূতা, (৭) কটি বন্ধনী, (কোমর বন্ধনী) (৮) পরিস্রাবণ (জল ছাঁকনি)–এই আট প্রকার ভিক্ষুর নিত্য ব্যবহার্য উপকরণের নাম অষ্ট পরিষ্কার।

ধর্ম দেশনা করিয়া ছিলেন ঃ-

অষ্ট পরিষ্কার যে কোন দায়ক-দায়িকা শ্রদ্ধাচিত্তে ভিক্ষু বা ভিক্ষু সংঘকে দান করা উচিত। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি প্রসন্নচিত্তে অষ্ট পরিষ্কার দানে জন্মে জন্মে ধনশালী, ভোগশালী ও সুশ্রী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। শ্রদ্ধাবতী নারী প্রসন্ন চিত্তে অষ্ট পরিষ্কার দানে ধনবর্তী, ভোগবতী ও রূপবতী হয় এবং মনোহর অলঙ্কার লাভ করে। এমন কি মহালতা প্রসাধন নামক মহামূল্য অঙ্গভূষণও লাভ করে। দান দেবব্রহ্ম লোকের এবং মুক্তি মার্গেরও সোপান।

পরিশুদ্ধ চিত্তে চীবর দানে সুশ্রী হয়, ভিক্ষাপাত্র দানে ভোগশালী (ধনবান) হয়, ক্ষুর দানে শাস্ত্র বিশারদ হইয়া মানবের সন্দেহ ভঞ্জন করে, সূচ-সূতা দানে বিচক্ষণ-বুদ্ধিমান-সুপণ্ডিত-প্রসিদ্ধ শিল্পী হয়, কোমর বন্ধবী দানে দীর্ঘায়ু হয়, জল ছাঁকনি দানে বিশুদ্ধকায়-নীরোগ-নির্ভয়-নিস্পাপ হয়। এতদ্ব্যতীত প্রসন্ন চিত্তে মনে মনে প্রার্থনা সহকারে ভিক্ষু সংঘকে অষ্ট পরিষ্কার দানে ভবিষ্যতে বুদ্ধের জীবমানকালে ঋদ্ধিময় অষ্ট পরিষ্কার লাভের হেতু উৎপন্ন হয়। সেইজন্য বৌদ্ধ মাত্রেই শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রসন্ন চিত্তে ভিক্ষুদের নিত্য ব্যবহার্য অষ্ট পরিষ্কার দান করা অবশ্যই কর্তব্যকর্ম। এতাদৃশ দান

বৌদ্ধোচিত আচরণ।

৫৪। বোধিসত্বরূপী সিদ্ধার্ত আষাঢ়ী পূর্ণিমা গভীর রাত্রে অশ্বরোহনে মহাভিনিষ্ক্রমনের পর মগধরাজ্যের অনোমা নদীর তীরে প্রভাতে উপনীত হইয়া কণ্ঠিক নামক অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে তাঁহার অতীত জন্মের প্রাচীন বন্ধু-কুম্ভকার ছদ্মবেশী মহাব্রহ্মা কর্তৃক প্রদাত্ত ভিক্ষুদের ব্যবহার্য সন্যাসীর পোষাক ও মাটির ভিক্ষাপাত্র গ্রহণে প্রব্রজিত বেশ ধারণ করিয়া রাজকীয় পোষাক সারথি ছন্দ্রকের হস্তে দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। অতঃপর তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মস্তকস্থিত কেশকলাপ শ্রামন্য জীবনের পক্ষে শোভনীয় নহে। আবার অন্য কাহারও দ্বারা শিরমুণ্ডন করাও অনুচিত। তাই তিনি সুদীর্ঘ কেশদাম দক্ষিণ হস্তে অসি এবং বাম হস্তে রাজমুকুট সহ মস্তকের কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়া নিজেই কর্তন করিলেন। কর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বি আঙ্গুল প্রমাণ কেশমূল সমূহ ক্রমাগত দক্ষিণ মুখী আবর্তিত হইয়া তাঁহার শিরচর্মেলীন হইয়াছিল। জীবিত কালাবধি তাঁহার কেশ, গুম্প ও শ্মশ্রু সেই পরিমাণই ছিল। পুনরায় কোন দিন ছেদন করার প্রয়োজন হয় নাই। তৎপর বোধিসত্ব রাজমুকুট ও ছিন্ন কেশ গুচ্ছ হস্তে ধারণ করিয়া উচ্চস্বরে বলিলেন,–"যদি সত্য সত্যই আমার বুদ্ধত্ব লাভের নিশ্চয়তা থাকে, তাহা হইলে এই কেশগুচ্ছ উর্ধাকাশে স্থিত থাকিবে, অন্যথায় ভুমিতে পতিত হইবে।" এই সত্যক্রিয়া উচ্চারণ করিয়া কেশধাম উর্ধ দিকে নিক্ষেপ করিলে যোজন প্রমাণ উর্ধে উঠিয়া অন্তরীক্ষে স্থিত হইয়া রহিল। তৎক্ষণাৎ দেবরাজ ইন্দ্র তাহা দিব্য চক্ষে দর্শন করিয়া এক স্বর্ণপাত্রে কেশদাম গ্রহণ করিয়া তাবতিংস দেবলোকে চুলমনি নামক চৈত্যে প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তদবধি কর্তৃক পূজিত হইতেছে।

তজ্জন্য বৌদ্ধেরা সিদ্ধার্থ তথা বোধি সত্বের মহাভিনিষ্ক্রমণের দিন আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ছিন্ন কেশদামের স্মৃতি স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার

মানসে ভিক্ষুদের বর্ষাবাস আরম্ভের দিন আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্ব উদ্‌যাপিত দিবসে মহাসমারোহে প্রত্যেক বিহারে সন্ধ্যা কালে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করিয়া ফানস বাতি দিয়া থাকে।

৫৫। ভগবান বুদ্ধের ধর্ম দেশনা অনুসারে আশ্বিনী পূর্ণিমার পর দিবস হইতে কার্ত্তিক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সর্বদান শ্রেষ্ঠ কঠিন চীবর দানের শ্রেষ্ঠ সময়। তদ্ধেতু উক্ত সময়কে শ্রেষ্ঠ সময় মনে করিয়া বোধিসত্বরূপী সিদ্ধার্থের ছিন্ন কেশদাম পূজার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধদের আকাশ প্রদীপ দেওয়ার রীতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছি।

৫৬। ভিক্ষুদের ব্যবহৃত কাপড়কে চীবর বলে। একদা শীতকালে ভাগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে বিদেশ ভ্রমনকালে বহুচীবর কষ্টে বহন করিতে দেখিলেন। এতৎদর্শনে তিনি শীতকালে বৈশালীতে উপনীত হইয়া রাত্রির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ যাম পর্যন্ত শীত অনুভব করিলেন। কতকগুলি চীবর ব্যবহার করিলে শীত নিরারণ করা যায়, তাহা পরীক্ষা করিয়া তিনি সংঘাটি, উত্তরাসঙ্গ ও অর্ন্তবাস এই তিনখানি চীবর ভিক্ষু সংঘকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন। সেই সময় হইতে অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত ত্রিচীবর ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। ত্রিচীবরের মধ্যে যে কোন একখানি চীবর দ্বারা কঠিন চীবর দান করা যাইতে পারে। যেই দিন কঠিন চীবর দান করা হইবে, সেইদিন পূর্বরাত্রি ও দিবা ২৪ ঘন্টার মধ্যেই সূতা পিঁজা, সূতা কাটা, কাপড় বুনা, সেলাই করা, রং করা ইত্যাদি চীবর প্রস্তুতির যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিয়া ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল গ্রহনান্তে দান কার্য সম্পাদন করিতে হয়। কঠিন চীবর দান করিবার সময়ে কঠিন চীবর লাভী ভিক্ষু ব্যতীত কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর প্রয়োজন। অবশ্য কঠিন চীবর প্রদান কালে যত অধিক শীলবান ও জ্ঞানবান ভিক্ষু হয়, ততই উত্তম। সেইদিন যাহা কিছু দান করা হয়, তাহা সমস্তই কঠিন চীবর লাভী ভিক্ষুরই প্রাপ্য। কঠিন লাভী ভিক্ষুকে চীবর কঠিন প্রাপ্তির

পর হইতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্যন্ত চারি মাস বিনয়ের বিধান অনুসারে চীবরখানি ব্যবহার করিতে হয়। এই চীবর খানি ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিনয়ের বিধান অনুসারে দায়ক-দায়িকাদের পক্ষে দারনর করা এবং ভিক্ষুদের পক্ষে বিনয়ের কঠোর নিয়মের মাধ্যমে চারি মাস ব্যবহার করা অতিশয় কষ্টকর ও দুঃসাধ্য বলিয়া এই চীবরখানিকে কঠিন চীবর নামে অভিহিত হইয়াছে।

ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান কালে পশ্চিম দেশীয় পাথেয়বাসী ত্রিশজন ভিক্ষু ভগবান বুদ্ধকে দর্শন করার মানসে জেতবন বিহারে আসিতেছিলেন। তাঁহারা সাকেত নগরে উপস্থিত হইলে ভাবিতে লাগিলেন,–সাকেত নগর হইতে জেতবন বিহার ছয় যোজন* ব্যবধান। আসন্ন বর্ষায় জেতবন বিহারে উপস্থিত হইয়া ভগবান বুদ্ধকে দর্শন করিয়া বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করা সম্ভবপর নহে মনে করিয়া পথের মধ্যে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিহার সাকেত নগরে উৎকণ্ঠিত চিত্তে বর্ষাবাস আরম্ভ করেন। বর্ষাবাসে পরিসমাপ্ত করিয়া বর্ষার সকল কর্দম ঠিকরাইয়া পড়া সিক্ত চীবরে ক্লান্ত অবস্থায় জেতবন বিহারে গিয়া ভগবান বুদ্ধকে অভিবাদন করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। বুদ্ধ আগন্তুক ভিক্ষুদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া জেতবন বিহারে অবস্থিত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি আদেশ করিতেছি যে বর্ষাবাস উদ্‌যাপিত ভিক্ষুগণ কঠিন চীবর আস্তীর্ণ করিতে পারিবে।" তখন হইতে কঠিন চীবর প্রথা ভিক্ষু সংঘে প্রবর্তিত হয়। সর্ব দান শ্রেষ্ঠ কঠিন চীবর, বর্ষাবাস উদ্‌যাপিত বিহারে বৎসরে একবার মাত্র 'আশ্বিনী পূর্ণিমার পর দিবস হইতে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত' কে মাস নির্দিষ্ট কাল সীমায় ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীলে স্থিত হইয়া দান কার্য সম্পাদন করিতে হয়। ইহার পুণ্যফল অপরিমেয়। নির্বাণ লাভ করিতে হইলে মানব মাত্রেই শ্রদ্ধাচিত্তে কঠিন চীবর দান করিতে হয়। আর

কঠিন চীবর দানের ফলে দেবলোকস্থিত কল্পতরু সদৃশ নিজ নিজ ইচ্ছিত বস্তু লাভ করা যায়। ইহাই বৌদ্ধ ধর্মের বাণী। তজ্জন্য এই কঠিন চীবর দানের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধেরা প্রত্যেক বিহারে 'চীবর - পিণ্ড-শয্যা-ঔষধ' এই চতুর্বির্ধ প্রত্যয় প্রদানে ভিক্ষুর উপযোগী বর্ষাবাসের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ইহাই সর্বজন প্রশংসিত বৌদ্ধোচিত আচরণ। [দ্রষ্টব্যঃ *যোজনঃ চারি ক্রোশে এক যোজন। এক ক্রোশ=দুই মাইল। এক যোজন=৮ মাইল। ছয় যোজন=৬ X ৮=৪৮ মাইল।]

৫৭। প্রত্যেক বিহারের দায়ক দায়িকাবৃন্দ বিনয়ের বিধানে অনুসারে' পিণ্ড, শয্যা, ঔষধ ও চীবর' এই চতু প্রত্যয় প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রত্যেক গ্রামে ভিক্ষুক আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিনমাস বর্ষাবাস উদ্‌যাপনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সেই অনুরোধ প্রত্যেক গ্রামে বিনয়ের বিধান অনুসারে ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করেন। সেই সময়ে প্রত্যেক বিহারের উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, শুক্লপক্ষের ও কৃষ্ণপক্ষে: অষ্টমী তিথিতে অষ্টশীল প্রতিপালন করেন। আশ্বিনী পূর্ণিমার দিনে বর্ষাবাস পরিসমাপ্তি হয়। ভগবান বুদ্ধের জীবমানকালে প্রত্যেক বিহারে বহু ভিক্ষু এক সঙ্গে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করিতেন। বহু ভিক্ষু এক সঙ্গে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন হেতু পরস্পর দোষ-ত্রুটি, তর্ক বিতর্ক, বাদ-বিসংবাদ প্রভৃতি মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা অত্যধিক ছিল বলিয়া আশ্বিনী পূর্ণিমা দিবসে পরস্পর দোষ ত্রুটি স্বীকার পূর্বক ক্ষমা প্রদর্শনে পূর্ববৎ অকপট চিত্তে মিলনের জন্য ভগবান বুদ্ধ নির্দেশ প্রদান করেন। তজ্জন্য ভিক্ষুদের বর্ষাবাস পরিসমাপ্তির প্রবারণ দিবসকে প্রবারণা দিবস বলা হয়। এই প্রবারণা দিবস হইতেছে, বৌদ্ধদের অভিলাষ পুরণের দিন, বিজয়ের দিন, আনন্দের দিন। আশ্বিনী পূর্ণিমাকে আবার প্রবারণা পূর্ণিমা নামেও অভিহিত হয় এই

প্রবারণা দুই প্রকার। যথা ঃ- পূর্ব কার্তিক প্রবারণা ও পশ্চিম কার্তিক প্রবারণা।

বিনয়ের বিধান অনুসারে আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী পূর্নিমা পর্যন্ত এই তিনমাসে বর্ষাবাসে উদ্‌যাপন পরিসমাপ্ত হইলে আশ্বিনী পূর্ণিমা উদ্‌যাপনের পর এক মাস ব্যাপী কার্তিক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কঠিন চীবর দানের জন্য বিনয় অনুমোদিত নির্দেশ আছে। এই কঠিন চীবর দানের সময় কঠিন চীবর লাভী ভিক্ষু ব্যতীত ভিক্ষু সংঘে ন্যূনকল্পে পাঁচজন ভিক্ষুর প্রয়োজন। অবশ্য কঠিন চীবর দানে সময় যত অধিক শীলবান ও জ্ঞানবান ভিক্ষু হয় ততই উত্তম।

বিশেষ কোন কারণে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস আরম্ভের দিনে বর্ষবাসে উদ্‌যাপন করিতে না পারিলে শ্রাবণী পুর্ণিমায় বর্ষাবাস আরম্ভ করিতে পারেন। সেই ভিক্ষুর বষাবাস পরিসমাপ্তি হয় কার্তিকী পুর্ণিমায়। ইহাকে বলা হয় পশ্চিম কার্তিক প্রবারণা। পশ্চিম কার্তিক প্রবারণার পর কঠিন চীবর দানের জন্য বিনয়ের কোন বিধান নাই। বর্ষাবাস আরম্ভের দিন আষাঢ়ী পূর্ণিমা এবং পরিসমাপ্তির দিন আশ্বিনী পূর্ণিমা, এই দুই দিন বৌদ্ধদের উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় দিবস। অবশ্য কঠিন চীবর উদ্‌যাপন বিহীন বিহারের দায়ক-দায়িকাবৃন্দ ইচ্ছা করিলে (১) সংঘাটি, (২) উত্তরাসঙ্গ, (৩) অর্ন্তবাস, (৪) ভিক্ষা পাত্র, (৫) ক্ষুর, (৬) সূচ-সূতা, (৭) কটি বন্ধনী, (৮) পরিস্রাবন,-এই অষ্ট পরিষ্কার দান করিতে পারেন। এই সকল উৎসব যথাযথভাবে প্রতিপালন করাই বৌদ্ধোচিত আচরণ।

৫৮। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বোয়ালখালী থানার প্রজ্ঞালোকে মহাস্থবির, পটিয়া থানার বংশদীপ মহাস্থবির ও জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির এবং রাঙ্গুনীয়া থানার রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির ও ধর্মানন্দ মহাস্থবির,–এই পাঁচজন মহাস্থবির সিংহলের সদ্ধর্মোদয় পালি পরিবেশনে একসঙ্গে বিনয়-

ধর্মে শিক্ষা সমাপ্তির পর চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সিংহলের কঠিন চীবর দানের অনুকরণে ভগবান বুদ্ধ প্রবর্তিত বাংলাদেশের বিলুপ্ত কঠিন চীবর দানও এতদ্দেশে সর্বপ্রথম পুনরায় প্রবর্তন করেন। তাঁহারা সেই সময় হইতে এখানকার প্রাচীন সংঘদান প্রথাও পরিবর্তন করিয়া থেরবাদী সিংগল বাসীদের ন্যায় পিণ্ডদান গ্রহণের প্রথা প্রবর্তন করেন। কিন্তু সংঘদানে যত অধিক শীলবান ও জ্ঞানবান ভিক্ষু হয় ততই উত্তম। সংঘদানের দ্রব্যাদি উপস্থিত ভিক্ষু সংঘ ব্যতীত বিনয়ের বিধান অনুসারে অন্য কেহ বিভাগ করিতে পারে না। আবার থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম বহির্ভূত দেবীর পূজাও তাঁহাদের প্রবল প্রচেষ্ঠায় সক্রিয় প্রচার কার্যে এতদ্দেশে মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন বৌদ্ধ জাতি হইতে ক্রমে ক্রমে অর্ন্তহিত হইয়া যায়। বৌদ্ধ জাতির এই সকল সংস্কার সাধন তাঁহাদেরই একমাত্র ঐকন্তিক কর্মতৎপরতার ফল। এই সকল আচরণ করাই বৌদ্ধ জাতির লক্ষণ।

৫৯। নিজের পুত্র কিংবা অন্য কাহাকেও প্রব্রজ্যা প্রদানের ইচ্ছা করিলে প্রথমে দুইখানি উত্তরা সঙ্গ, দুইকানি অন্তর্বাস, একটি ভিক্ষা পাত্র, একখানি ক্ষুর একখানি কটি বন্ধনী, একখানি জল ছাঁকনি এবং সুঁচ সূতা এই অষ্ট পরিষ্কার সংগ্রহ করিতে হয়। দুইখানি উত্তরাসঙ্গ হইতে একখানি সংঘাটি চীবর করিতে হয়। এতদ্‌ৎসঙ্গ একজোড়া সেণ্ডল, একখানা ছাতা, একটি যষ্টি ও একজনের শয্যা-উপকরণ (পাটি, বালিশ, বিছানার সুজানি ও গামছা) সহ সর্বমোট দ্বাদশ উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন। প্রব্রজ্যা প্রার্থীর কেশ শ্মশ্রু ক্ষুর দ্বারা ছেদন করিয়া বুদ্ধ সংকীর্তন ও শোভা যাত্রা সহকারে বিহারে গিয়া প্রব্যজ্যা প্রার্থী প্রথমে সকলে একসঙ্গে ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল গ্রহণ করিতে হয়। সংসার ধর্মে প্রবেশের পূর্বে বুদ্ধের প্রব্রজ্যা ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন, শেখিয়া ধর্ম আচরণ ও উপাসনা পদ্ধতি শিক্ষা এবং বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকার লাভের জন্য অভি-ভাবকগণ

কর্তৃক প্রত্যেক ছেলেকে কিছু দিনের জন্য সাময়িকভাবে হইলেও শ্রামণের প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা মাত্রেই অপরিহার্য কর্তব্য কর্ম। যেই ভিক্ষুর দশ বর্ষাবাস পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারেন, সেই ভিক্ষুই প্রব্রজ্যা প্রদান করিতে পারেন। প্রব্রজ্যা প্রদানকারী ভিক্ষু ও প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী শ্রামণের উভয়েই পালি উচ্চারণ এবং ত্রিশরণ গমণের উচ্চারণ বিশুদ্ধ হইতে হইবে। ত্রিশরণ গমণের উচ্চারণ বিশুদ্ধ না হইলে প্রব্রজ্যা প্রদান ঠিক হয় না। কিন্তু আবার যেই ভিক্ষু দশ বর্ষাবাস পরিপূর্ণ হয় নাই, সেই ভিক্ষু কোন মহাস্থবির বা স্থবিরের আদেশ ক্রমে উক্ত মহাস্থবির কিংবা স্থবিরের উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যা প্রদান করিতে পারেন; কিন্তু 'নিস্সয়' দিতে পারিবেন না। শ্রমণের বয়স বিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে উপসম্পদা প্রাপ্ত হইতে পারে।

৬০। এক সময়ে আনন্দ স্থবির ভগবান বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন,–বুদ্ধের অবর্তমানে শিষ্যেরা কাহাকে দর্শন করিবেন? তদুত্তরে ভগবান, বুদ্ধ বলিয়াছিলেন,–বুদ্ধের অবর্তমানে বুদ্ধের জন্মস্থান–কপিলাবস্তুর লুম্বিনী উদ্যান, বোধিজ্ঞান লাভের স্থান-গয়া জেলার বুদ্ধ গয়া, সর্বপ্রথম ধর্ম প্রচারের স্থান–বারানসী জেলার সারনাথ এবং পরিনির্বাণ লাভের স্থান গোরক্ষপুর জেলার কুশী নগর। এই চারিস্থান দর্শণ করিলে বুদ্ধকে দর্শন করা হয়। সেই জন্য এই সকল স্থানকে তীর্থস্থান বলা হয়। তীর্থ শব্দের অর্থ পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবার স্থান। সুতরাং এই সকল স্থান প্রত্যেকে শ্রদ্ধা সহকারে দর্শন করাই বৌদ্ধোচিত আচরণ।

৬১। ভগবান গৌতম বুদ্ধ অতীত বুদ্ধ গণের ন্যায় দিব্যজ্ঞানে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রিয়তম স্থায়ী সেবক আনন্দকে বৈশাখী পুর্ণিমায় কুশীনগরে দুইটি শাল বৃক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে উত্তর শির অবস্থায়

পরিনির্বাণ শয্যা প্রজ্ঞাপ্ত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আনন্দ দতনুরূপ পরিনির্বাণ শয্যা প্রজ্ঞাপ্ত করিলে বুদ্ধ উত্তর শিরে শয়ন করিয়া পরিনির্বাণ লাভ করিয়া ছিলেন। সেই জন্য বুদ্ধের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধ মাত্রেই মৃত্যুর সময়ে উত্তর শির করিয়া দেওয়া আবশ্যক। শবদাহের দিনেও মৃত ব্যক্তিকে উত্তর শির অবস্থায় ভিক্ষু বা ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক তাহার সদ্‌গতি কামনার জন্য বুদ্ধ বচনও আবৃত্তি করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বুদ্ধ যাহা প্রজ্ঞা বলে আচরণ করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করই বৌদ্ধোচিত্ত এবং বৌদ্ধদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য।

৬২। আর্য সত্য লব্ধ প্রজ্ঞাবান অরহত ভিক্ষুগণও উত্তর শিরে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধকে উত্তর শির করিয়অ শবদাহ করায় মৃত-ব্যক্তিকে উত্তর শির অবস্থায় চিতা সজ্জিত করতঃ শবদাহ করিয়া পূর্ব সূরীদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা বৌদ্ধদের বিবেক সম্মত অবশ্য কর্তব্য কর্ম।

কবির ভাষায় বলিতে গেলে–

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমণ
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধরে
আমরাও হ'ব বরণীয়।"

ইহাকেই বলা হয় বৌদ্ধোচিত আরচণ ও বৌদ্ধদের আদর্শ।

৬৩। ভগবান বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভের পূর্বে পাবাগ্রামে চুন্দ প্রদত্ত মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া পার্শ্ববর্তী গোরক্ষপুর জেলার কুশীনগরে মল্লরাজার শাল বাগানে দুইটি শাল বৃক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে সূর্যাস্ত গামী পশ্চিম দিককে সামনে রাখিয়া ডান পার্শ্ব হইয়া উত্তর শিরে শয়ন করিয়া রাত্রির মধ্যম যামে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে পরিনির্বাণ

লাভ করেন। তজ্জন্য বুদ্ধের পরিনির্বাণ মুর্তিও ডান পার্শ্ব করিয়া উত্তর শির অবস্থায় প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ইহা অনুকরণ করাই বৌদ্ধোহিত আচরণ।

৬৪। বৌদ্ধ ধর্মের নীতি অনুসারে জীবনের জন্মান্তর আছে, তজ্জন্য ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই। কমই মানবের সুখ-দুঃখের সৃষ্টি কর্তা। জন্মান্তরে গমন করিবার জন্য কোন শাশ্বত আত্মাও নাই। লোভ-দ্বেষ-মোহ দ্বারাই সংসার চক্র অবিদ্যাদি দ্বাদশ অঙ্গে ভ্রাম্যমান। তদ্ধেতু সমস্তই অনিত্য, সমস্তই দুঃখ, সমস্তই অনাত্মা। ইহাই ভগবান বুদ্ধের কার্যকারণ শৃঙ্খল নীতি বা * প্রতীত্রসমুৎপাদ (পূর্ববর্তী কারণে বর্তমানের উৎপত্তি)। প্রজ্ঞা চক্ষে ইহারই যথাযথ উপলব্ধির নাম সম্যক দৃষ্টি। এতাদৃশ প্রজ্ঞা লাভে যাবতীয় সন্দেহ ও তর্কবিতর্কের অবসান ঘটে।

বুদ্ধের নিম্নোক্ত ভাষিত গাথায় আরও সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় ঃ-

অত্তাহি অত্তনোত নাথো, কো হি নাথো পরোসিয়া ?
অত্তনা হি সুদন্তেন, নাথং লভতি দুল্লভং 'ধম্মপদ'

মানুষ কর্মফলে নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা। অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা নাই। যিনি নিজকে উত্তমরূপে সংযত করিতে সমর্থ হন, অর্থাৎ তৃষ্ণাক্ষয়ে লোভ-দ্বেষ-মোহ মুক্ত হন, তিনিই সেই সুদুর্লভ নির্বাণ লাভ করেন।

দ্রষ্টব্য : প্রতীত্য সমুৎপাদ=প্রতীত্য-প্রত্যয়, হেতু। সমুৎপাদ-সং+উৎপাদন=সম্যকভাবে উৎপন্ন। প্রতীত্য সমুৎপাদ–এক বস্তুর হেতুতে অপর বস্তু উপন্ন। ইহার অপর নাম দ্বাদশ নিদান। ইহাকে আবার সংসার চক্র বা ভবচক্র বলা হয়। এই প্রতীত্য সমুৎপাদ নামক

দ্বাদশ নিদানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা যথাযথ উপলব্ধির প্রয়োজন। ইহাই ভগবান বুদ্ধের নবাবিস্কৃত বৌদ্ধ দর্শন।

প্রতীত্য সমুৎপাদ ঃ

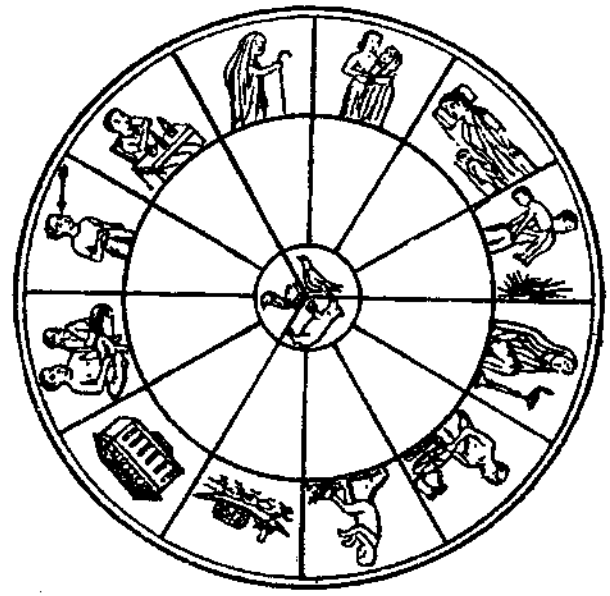

লোভ ঃ লোভ দ্বারা চরি-ব্যভিচা-নেশাপান করা হয়।
দ্বেষ ঃ দ্বেষ অর্থাৎ হিংসা দ্বারা প্রাণি হত্যা করা হয়।
মোহ ঃ মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানতা দ্বারা শিথ্যা বলা হয়। এই ত্রিবিধ কারণে সংসারচক্র।

১। অভিদ্যা হইতে সংস্কারের উৎপত্তি হয়।
২। সংস্কার হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়।
৩। বিজ্ঞান হইতে নাম রূপের উৎপত্তি হয়।
৪। নামরূপ হইতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি হয়।
৫। ষড়ায়তন হইতে স্পর্শের উৎপত্তি হয়।

৬। স্পর্শ হইতে বেদনার উৎপত্তি হয়।

৭। বেদা হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়।

৮। তৃষ্ণা হইতে ভবের উৎপত্তি হয়।

৯। উৎপাদন হইতে ভবের উৎপত্তি হয়।

১০। ভব হইতে জাতির উৎপত্তি হয়।

১১। জাতি বা জন্মের উৎপত্তি হয়।

১২। জরা মরণাদির ফল প্রাপ্ত হয়।

ইহাই ভগবান বুদ্ধের নবাবিস্কৃত প্রতীত্য সমুৎপাদ (পূববর্তী) কারণে বর্তমানের উৎপত্তি অর্থাৎ চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান)। ইহার অপর নাম দ্বাদশ নিদান। ইহাকে আবার সংসার চক্র বা ভবচক্র ও বলা হয়।

প্রতীত্য সমুৎপাদ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

১। অবিদ্যা ঃ অবিদ্যা শব্দের অর্থ যথাযথ জ্ঞানের অভাব। জগতের উৎপন্ন শীল পদার্থ মাত্রই অনিত্য দু-খ-অনাত্মা, তৎসম্বন্ধে অজ্ঞানতা। সমস্ত দুঃখের কারণ তৃষ্ণা, -তৎসম্বন্ধে অজ্ঞনতা। পঞ্চস্কন্ধ যে অনিত্য,-তৎ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। এই সকল অজ্ঞানতার নাম অবিদ্যা।

২। সংস্কার ঃ কায়-বাক্য-মনের কুশল ও অকুশল কর্মের চাপ মনের উপর পতিত হয়, তাহাই সংস্কার যেমন কোন কোন ব্যক্তি যে কোন বিষয় শ্রবণ-মাত্রই মেধাশক্তির প্রভাবে সহজে উপলব্ধি করিতে পারে এবং জন সমাজে যতাযথভাবে প্রকাশ করিতে পারে। আবার তাহার সমবয়স্ক বা তাহার চেয়ে অধিক বয়স্ক ব্যক্তিও মেধাশক্তির অভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহাকেই বলা হয় পূর্ব জন্মের কুশল ও অকুশল জনিত সংস্কার।

৩। বিজ্ঞান ঃ মন বা চিত্ত বা চৈতসিককে বিজ্ঞান নামে অভিহিত

করা হয়। এই মনই ষড়েকন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রবহমান সন্তহি আকর্ষণের অধিনায়ক।

৪। নামরূপ ঃ সূক্ষ্ম বা মানসিক অংশই হইল নাম। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কারও বিজ্ঞান-এই চতুষ্টয়ের সমষ্টিকে নাম বলে বেদনা, সংস্কার ও বিজ্ঞান যথাক্রমে এই পাঠে ৭, ২, ৩, এ আলোচিত হইয়াছে। সংজ্ঞা লোহিত, নীল, পীত ইত্যাদির ন্যায় পর্থিব বস্তু সমূহে পৃথক পৃথক জ্ঞান লাভের নাম সংজ্ঞা।

স্থুল বা কায়িক অংশই হইল রূপ। ক্ষিতি (মাটি), অপ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) এই চতুষ্টয়ের সমষ্টিকে রূপ বলে। চর্ম, মাংস, অস্থি, শিরা, বিষ্ঠা, দন্ত ইত্যাদিকে ক্ষিতি (মাটি), অশ্রু, চর্বি, থুথু, শিখনী, মূত্র, রক্ত, ইত্যাদিকে অপ (জল); পরিপাক শক্তিকে তেজ (অগ্নি) শ্বাস-প্রশ্বাস এবং উর্ধগামী ও নিম্নগামী বায়ুকে মরুৎ বলে। এই নামরূপের অপর নাম পঞ্চস্কন্ধ। পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিই জীব।

৫। ষড়ায়তন ঃ নামরূপ উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নামরূপের কাজ করার জন্য ষড়ায়তন বা ষড়েন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় ষড়োন্দ্রিয় বলিতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক (চামড়া) এবং ইহাদের অধিনায়ক মনকে বুঝায়।

৬। স্পর্শ ঃ ষড়ায়তন বা ষড়েন্দ্রিয় বস্তুর সংস্রবে আসিলেই স্পর্শের উৎপত্তি হয়। স্পর্শ ব্যতীত যে কোন বস্তু সঠিক ধারণা করা যায় না।

৭। বেদনা ঃ স্পর্শের ফলে পছন্দ ও অপছন্দ অনুসারে সুখ-দুঃখ-উপেক্ষা অনুভূতির নাম বেদনা।

৮। তৃষ্ণা ঃ সুখানুভূতি দ্বারা বস্তু নিচয়ের প্রতি আসক্তি উৎপন্ন হওয়ার নাম তৃষ্ণা। তৃষ্ণা তিন প্রকার, যথাঃ- কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভব

তৃষ্ণা সংসারের প্রতি আসক্তির নাম কাম তৃষ্ণা, শাশ্বত (চিরস্থায়ী) জনিত দৃষ্টির নাম ভব তৃষ্ণা, উচ্ছেদ (মৃত্যুর পর জন্ম না হওয়া) জনিত দৃষ্টির নাম বিভব তৃষ্ণা।

৯। উপাদান ঃ ষড়েন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুর প্রতি তৃষ্ণা গাঢ় হইতে গাঢ়তর হওয়ার নাম উপাদান বা দৃঢ় আসক্তি। কাম্যবস্তু লাভের জন্য প্রবল আসক্তি উৎপাদনের নাম উপাদান।

১০। ভব ঃ উপাদান অর্থাৎ দৃঢ় আসক্তির ফলেই ভব এর উৎপত্তি হয়। ভব শব্দের অর্থ হওয়া বা হওয়ার আকাঙ্খা। যদ্বারা ভোগ্যবস্তু সমূহ ভোগ করা যায়, তাহাই হওয়ার আকাঙ্খা।

১১। জাতি ঃ ভব হইতে জাতি অর্থাৎ জন্মে উৎপত্তি হয়।

১২। জরামরণাদি ঃ জন্ম হইলেই জরা মরণাদির ফল প্রাপ্ত হয়। এই জরা (বার্ধক্য), ব্যাধি, মৃত্যু হইতে সংসারে কেহই অব্যাহতি (মুক্তি) লাভ করিতে পারে না।

"বুদ্ধ সাসনং চিরং তিট্‌ঠতু,
সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু।"

বিশ্বমাঝে বসবাস করুক সকলে,
প্রাণিগণ সুখী হোক সদ্ধর্ম সম্বলে।
বেঁচে থাক চিরকাল বুদ্ধানুশাসন,
ত্রিরত্ন নন্দিত পুত-পবিত্র জীবন।

- সমাপ্ত -